বিকিরণ

পরিবেশ

ও পারমাণবিক

নিরাপত্তা

-৬৫
বি
৬

ডঃ আবদুল জলিল

বিকিরণ নিরোধ ও পারমাণবিক নিরাপত্তা

বিকিরণ নিরোধ
ও
পারমাণবিক নিরাপত্তা

ডঃ আবদুল জলিল

বিভাগীয় প্রধান
স্বাস্থ্য পদার্থবিজ্ঞান ও বিকিরণ নিরোধ বিভাগ
নিউক্লীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট
পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান
গণকবাড়ি, সাভার, ঢাকা

বাংলা একাডেমী ঢাকা

BANSDOC Library

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০০
জুন ১৯৯৩

বাএ ২৭৪৩

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি
ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগ

ভৌতবি ১২৪

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
উৎপল দাস

মূল্য
ষাট টাকা

BIKIRON NIRODH O PAROMANOBIK NIRAPATTA (Radiation Protection and Nuclear Safety) by Dr. Abdul Jalil, Principal Scientific Officer, Bangladesh Atomic Energy Commission, Savar, Dhaka. Published by Gholam Moyenuddin, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition, June 1993. Price : Taka 60·00.

ISBN 984-07-2752-4

উৎসর্গ

আমার স্ত্রী জিন্নাত জলিল, কন্যা
এলহাম এবং পুত্র এহতেশাম
ও এহসানের উদ্দেশে

মুখবন্ধ

বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন থেকে শুরু করে চিকিৎসা, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার আজ বিশ্ব জোড়া। কি গরীব কি ধনী সব দেশই শক্তির চাহিদা মেটাবার জন্য পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারে উদগ্রীব। স্মর্তব্য যে পারমাণবিক বোমার এক প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ১৯৪৫ সালে এ শক্তির পরিচিতি ঘটে সাধারণ্যে। এ শক্তিকে কাজে লাগানোর আগে এর ক্ষতিকর দিককে নিয়ন্ত্রণে আনা একান্তই আবশ্যকীয়। পারমাণবিক শক্তির একটি ক্ষতিকর দিক হচ্ছে বিকিরণপাত যা জীবদেহে অনেক বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। দক্ষ সাপুড়ে বিষাক্ত সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকা উপার্জন করে, কিন্তু আনাড়ির ক্ষেত্রে জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনাই বাড়ে। তাই শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের জন্য সর্বাগ্রে বিকিরণ নিরোধ ও পারমাণবিক নিরাপত্তার কৌশল ও বিধানাবলী জানা ও উপলব্ধি করা একান্ত জরুরী, ব্যবহারকারী ও পারমাণবিক শক্তির উৎস চালনাকারীদের জন্য। এতদুদ্দেশ্যেই এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে কেন পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরোধ ব্যবস্থা দরকার, পরিবেশস্থ বিকিরণ, জীবদেহে বিকিরণের প্রভাব, বিকিরণ পরিমাপনার্থে ব্যবহৃত এককসমূহ, বিকিরণ নিরোধ নির্দেশিকা (guide), তেজস্ক্রিয় উৎস ও বিকিরণের নিরাপদ পরিচালনার জন্য পালনীয় বিধানাবলী।

বাংলা ভাষায় এ জাতীয় কোনো পুস্তক লেখা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই, অথচ বাংলাদেশে বিকিরণ ও পরমাণু শক্তির ব্যাপক ব্যবহার চালু রয়েছে। আজও তার কারণে কিছু কিছু দুর্ঘটনা ঘটার কথা আমরা জানি। তাই ব্যবহারকারীরা যাতে দুর্ঘটনা এড়িয়ে নিজেকে নিরাপদ রেখে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেন এজন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

এই পুস্তক পাঠ্যবই হিসেবে ও সাধারণ জ্ঞানের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বইটি পড়ে কেউ উপকৃত হলে শ্রম সার্থক মনে হবে। যে কোনো গঠনমূলক পরামর্শ ও সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে।

BANSDOC Library
Accession No. 18869

বইটি রচনাকালে আমি অনেক লেখকের লেখা থেকে অনেক সাহায্য নিয়েছি সেজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। পুস্তকটি রচনাকালে আমার সহধর্মিনী বেগম জিন্নাত জলিল ও আমাদের মেয়ে এলহাম জলিল, পুত্র এহতেশাম জলিল ও মুহম্মদ এহসান জলিল অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা জুগিয়েছে ও সহায়তা করেছে। অন্যথায় এ বই হয়তো দিনের আলোই দেখত না। তাদেরকে আমার অশেষ শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। বাংলা একাডেমীর ভৌতবিজ্ঞান ও প্রকৌশল উপবিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

ডঃ আবদুল জলিল

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরোধ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ১—৪

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বিকিরণ ও পরিবেশ ৫—৯

তৃতীয় অধ্যায় ঃ জীবদেহে বিকিরণের প্রভাব ১০—৩৮

৩.১ জীবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব

৩.২ জীবদেহে অতেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব

চতুর্থ অধ্যায় ঃ বিকিরণ পরিমাপণে ব্যবহৃত এককসমূহ ৩৯—৫০

৪.১ পরিচিতি

৪.২ তেজস্ক্রিয়তার একক

৪.৩ বিকিরণপাত ও বিশোষিত ডোজের একক

৪.৩.১ রন্টগেন একক

৪.৩.২ বিশোষিত ডোজের একক

৪.৪ আপেক্ষিক তেজস্ক্রিয়তা

৪.৫ রৈখিক শক্তি স্থানান্তর বা LET

৪.৬ বিকিরণপাত মাত্রা সমতুল

৪.৭ কার্যকর ডোজ সমতুল

৪.৮ কমিটেড ডোজ সমতুল

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বিকিরণ নিরোধ নির্দেশিকা ৫১—৫৯

৫.১ ভূমিকা

৫.২ বিকিরণ নিরোধ বিধি ও ডোজসীমা বেঁধে দেওয়ার যুক্তিযুক্ততা

৫.৩ বিকিরণ নিরোধ ও নিরাপত্তার্থে প্রযোজ্য মূলনীতিমালা

৫.৪ কার্যকর মাত্রা-সমতুল

৫.৫ বিকিরণপাতের ধরন

৫.৬ তেজস্ক্রিয় উপাদান শারীরিকরণের অনুমোদনযোগ্য সীমা

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এবং বস্তুর নিরাপদ চালনা ও ব্যবহার ৬০—৭২

৬.১ ভূমিকা

৬.২ তেজস্ক্রিয় উৎস চালনাকালে উদ্ভূত আপদ

৬.৩ দেহবহিঃস্থ বিকিরণ-উৎস থেকে উদ্ভূত আপদ নিয়ন্ত্রণ

৬.৪ অভ্যন্তরীণ বিকিরণ-উৎস থেকে উদ্ভূত বিকিরণপাত এবং তৎসমুদয় নিয়ন্ত্রণ

৬.৫ ভৌত রক্ষণাবেক্ষণ

৬.৬ বিকিরণ উৎস-অন্তরীণকরণ ও নির্মল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ

৬.৭ নিরোধক পরিচ্ছেদ

৬.৮ বিকিরণ প্রতিষ্ঠানাদি ও উৎস মওজুদাগারের আলাদা অবস্থান

৬.৯ বিকিরণ যন্ত্রায়ন

৬.১০ তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরিবহণ

৬.১১ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

সপ্তম অধ্যায়ঃ সুস্বাস্থ্য লাভে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ৭৩—৮১

সহায়ক গ্রন্থাবলী ৮২

প্রথম অধ্যায়

পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরোধ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

ভূমিকা

তেজস্ক্রিয়তা ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক অনন্য অবদান। কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে উন্নয়নে ও গবেষণায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বহুল ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সমস্যা আজ দুনিয়াশুদ্ধ মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রসর উন্নত দেশগুলোতে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিরোধ (radiation protection) ও পারমাণবিক নিরাপত্তা (nuclear safety) নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং সমস্যার সমাধান বের করার চেষ্টা চলছে। অনুন্নত বিশ্বেও যেসব দেশে পারমাণবিক কর্মসূচি রয়েছে তথায় এ সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছে। কারণ জনমনে প্রশ্ন জাগছে যে বিকিরণ নিরোধ ও পারমাণবিক নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থাদি গৃহীত ও পালিত হচ্ছে কিনা। বাংলাদেশও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম কিছু নয়। অতি-সম্প্রতি সংঘটিত তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত কতিপয় দুর্ঘটনা থেকে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ উৎসজনিত এই ঘটনাটি ঘটে ব্রাজিলের গোওয়ানিয়া (Goinia) শহরে। সেখানে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে ব্যবহৃত একটি সিজিয়াম-১৩৭ টেলিথেরাপি মেশিন অরক্ষিত অবস্থায় পড়েছিল এক পরিত্যক্ত চিকিৎসালয়ের আঙ্গিনায়। ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ সালে সেটি পুরনো লোহালক্কড় ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে। তারা অজ্ঞতাবশত তা ভেঙ্গে ফেলে। এর ফলে তন্মধ্যস্থ তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং তেজস্ক্রিয়াজনিত দূষণে কতিপয় ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, অনেককে দূষণমুক্ত করতে হয় এবং শহরের বিরাট এলাকায় তেজস্ক্রিয়াজনিত দূষণ ঘটে। এসব দূষণমুক্তকরণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। তদ্রূপ মেক্সিকোর জুয়ারেজেও একখানি কোবাল্ট-৬০ বিকিরণ-উৎস দায়িত্বহীনভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং নির্দোষ অজ্ঞলোকের হাতে পড়ে সমূহ সর্বনাশ ডেকে আনে। এ ধরনের বহু ঘটনা আজো ঘটে চলেছে। যেমন অতিসম্প্রতি ইরিডিয়াম-১৯২ বিকিরণ-উৎসের নিরাপত্তা আবরণী (shielding) খালি ভেবে পুনরায় তা ভরে আনার জন্য জাহাজযোগে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসে

প্রেরিত হয়। শিল্প-রেডিওগ্রাফিতে (Industrial radiography) ব্যবহারের জন্য ইরিডিয়াম-১৯২ উৎস পরিবহণকালে নিরাপত্তার জন্য আবরণীগুলি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর দেখা গেল একটি আধারের (container) আবরণীবিহীন (unshielded) স্থানে একটি ইরিডিয়াম-১৯২ উৎস রয়ে গেছে, অথচ আধারটিতে সেটি থাকার কথা ছিল না আর থাকলেও খুব ভালোভাবে আবৃত জায়গায় থাকা উচিত ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে বাংলাদেশেও ১৯৮৫ সালের ১০ জুন তারিখে ঢাকার অদূরে মেঘনা ফেরিঘাটে গ্যাস পাইপ লাইনের ঝালাই-জোড়ার (weld-joints) নিংবংসী পরখকল্পে (nondestructive testing) বিকিরণলেখ গ্রহণকালে জনৈক নিরীহ, অজ্ঞ কর্মী দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছেন। ফলে তাঁর উভয় হাতের সবকয়টি আঙুলের অগ্রভাগ ইতোমধ্যেই খসে পড়েছে এবং অনিরাময়যোগ্য ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ এবং টেলিভিশনে সমপ্রচার করা হয়। আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নাল Health Physics (খণ্ড ৫৭, সংখ্যা ১, ১৯৮৯, পৃ. ১১৭-১১৯) এ এতদ্ সংক্রান্ত গবেষণা-প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে এবং তজ্জন্য পরবর্তীতে দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির দেহে সংঘটিত প্রভাবাদি পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত ফলাফল উক্ত জার্নালটির জানুয়ারি, ১৯৯২ সংখ্যায় (খণ্ড ৬২, সংখ্যা ১) ছাপা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে ধরা পড়ে, উক্ত কাজে ব্যবহৃত ইরিডিয়াম-১৯২ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ-উৎসটি কার্যসম্পাদনকালে গাইড (guide) নলের মাথায় সংযোগ-চ্যুত (decoupled) হয়ে পড়ে আর এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্মী অজ্ঞতাবশত হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে কাজ চালিয়ে যান। এর কারণ তিনি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ তথা উৎস সম্পর্কে কিছুই জানতেন না, এ বিষয়ে তাঁর কোনো প্রশিক্ষণও ছিলো না। কর্মীটি লেখাপড়াও তেমন জানতেন না। তাঁর সাথে কোনো বিকিরণ জরিপ মিটার (survey meter) বা ডসিমিটারও ছিল না। ফলে তিনি বুঝতেই পারেন নি যে বিকিরণ-উৎসটি উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশে আজও কোনো বিকিরণ নিরোধ সংক্রান্ত আইন নেই। তাই নানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নামমাত্র মজুরিতে দরিদ্র, অজ্ঞ ও যথার্থ প্রশিক্ষণহীন শ্রমিকদের দিয়ে এসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করিয়ে নেয়। আইন বা শাস্তির বিধান নেই বলে বিকিরণ নিরোধের ব্যাপারটা এরা সহজেই এড়িয়ে যায়; দুর্ঘটনা ঘটলে কোনো ক্ষতিপূরণও দিতে হয় না।

উপরিউক্ত দুর্ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে একটু সচেতন হলে এবং বিকিরণ নিরোধকল্পে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, যেমন আন্তর্জাতিক রেডিওলজিক্যাল নিরোধ সংস্থা

International Commission on Radiological Protection (ICRP), IAEA, International Commission on Radiological Units and Measurements (ICRU), ILO, National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) এবং তদুদ্দেশ্যে দেশে গঠিত বা ভারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সময় সময় সুপারিশকৃত নিয়মাবলী মেনে চললে এবং তদনুযায়ী বিকিরণ-উৎস চালনা করলে কোনো দুর্ঘটনা বা ক্ষতি ঘটার সম্ভাবনা থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, এযাবত তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতজনিত রোগব্যাধি সম্বন্ধে যত গবেষণা ও আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে রোগব্যাধি উৎপাদনকারী অন্য কোনো রোগহেতু (etiology) নিয়ে তত কাজ আজও হয়নি। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ জীবদেহে কিভাবে কাজ করে বিশেষ করে দেহকোষ, দেহের অণু-পরমাণু ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর এর কি প্রভাব তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করা হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এ ব্যাপারে এত বেশি নিখুঁত ও নির্ভুল উপাত্ত ইতোমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে যে এর উপর ভিত্তি করে স্বাস্থ্য-পদার্থবিদরা (Health Physicists) কোনো চিকিৎসাগত, বৈজ্ঞানিক বা শিল্প ক্ষেত্রে পারমাণবিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে পরিবেশের বিকিরণ মাত্রায় কি পরিবর্তন আসতে পারে, কতটুকু তেজস্ক্রিয় জঞ্জাল উৎপাদিত হবে এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষণার্থে কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে এসব বিষয়ে সুনির্ধারিতভাবে দিকনির্দেশ দিতে পারেন। বিকিরণ নিরোধ ও পারমাণবিক নিরাপত্তা বিষয়টিতে তাই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অতেজস্ক্রিয় (nonionizing) বিকিরণ প্রয়োগকালে উদ্ভূত ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ব্যক্তি তথা জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার ব্যাপারটি। এর আওতায় পড়ে বিকিরণ নিরোধ এবং নিরাপত্তা তথা পরিবেশ ও স্বাস্থ্য রক্ষা।

বিকিরণ নিরোধ ও পারমাণবিক নিরাপত্তা বিষয়টির বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত দিকসমূহ হচ্ছে: (১) বিকিরণপাত (radiation exposure) ও তদ্দরুন সৃষ্ট দৈহিক প্রভাবের (damage) মধ্যে বিদ্যমান পরিমাণগত সম্পর্ক নিরূপণ, (২) বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ ও তেজস্ক্রিয় বস্তুর ভৌত পরিমাপন (physical measurement), (৩) তেজস্ক্রিয় বস্তুর নিরাপদ পরিবহণ, এবং (৪) বিকিরণমুক্ত থেকে নিরাপদ যন্ত্রপাতি ও পরিবেশ ডিজাইন করা। তাই দেখা যাচ্ছে বিকিরণ নিরোধের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র ও প্রকৌশল-বিদ্যাসহ বিজ্ঞানের যাবতীয় শাখা। তাই এ সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া দরকার পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিরোধ কর্মে নিয়োজিত কর্মীদল।

BANSDOC Library
Accession No.....

যে কোনো কাজ সম্পাদনকালে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় পূর্ব-পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, সাবধানতা ও সচেতনতার বিকল্প আর কিছু নেই। বিকিরণ নিরোধ ও পারমাণবিক নিরাপত্তার বেলায় একথা আরও বেশি প্রযোজ্য। তাই এক্ষেত্রে কার্যবিধি তথা উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার বিধানাবলী পূর্বাহ্নে বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিকিরণ ও পরিবেশ

পরিচিতি

এ মহাবিশ্ব দুই ধরনের উপাদানে গড়ে উঠেছে। তার একটি হচ্ছে পদার্থ আর অপরটি শক্তি। যা জায়গা দখল করে, বল প্রয়োগে বাধা দেয়, যার ওজন ও জড়তা আছে, যা কঠিন তরল ও বায়বীয় এ তিন অবস্থার যে কোনো অবস্থায় থাকতে পারে, যাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যে কোনোটি দিয়ে অনুভব করা যায় তাকে বস্তু বলে। যেমন মাটি, পানি, বাতাস, চেয়ার, টেবিল, থালা, বাসন, ঘটি, বাটি, অক্সিজেন ইত্যাদি। কোনো বস্তু বা উৎসের (agent) কাজ করার ক্ষমতাকে শক্তি বলে। শক্তি বস্তুর সাথে যুক্ত হয়ে বস্তুর অবস্থা, প্রকৃতি ও অবস্থান বদলাতে পারে। ইহা জায়গা দখল করে না, এর ওজনও নেই। বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল শক্তির অভাবে বস্তু নিশ্চল ও স্থবির হয়ে পড়ে, শক্তির প্রভাবে সচল হয়। চোখ দিয়ে না দেখলেও বস্তুর সাথে আকার সংশ্লিষ্ট থাকায় এর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। শক্তির রয়েছে নানা ধরন ও বহিঃপ্রকাশ। তন্মধ্যে তাপ, আলো, শব্দ, বিদ্যুৎ, চুম্বক, রাসায়নিক, পারমাণবিক, মাধ্যাকর্ষণ, মহাকর্ষ ইত্যাদি রূপে শক্তির যে বহিঃপ্রকাশ তার সাথে আমরা সুপরিচিত। শক্তির ওজন, আকার বা আয়তন নেই। এর ক্ষয় নেই; শুধুমাত্র রূপান্তর রয়েছে। বস্তু ও শক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং পরস্পর আন্তঃরূপান্তরণীয়। অর্থাৎ ক্ষেত্র-বিশেষে বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, আবার ক্ষেত্রবিশেষে শক্তিও বস্তুতে রূপান্তর লাভ করে থাকে।

শক্তি এক জায়গা থেকে তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়ে অন্যত্র গেলে তাকে বিকীর্ণ (radiated) শক্তি বলে আর প্রক্রিয়াটিকে বলে বিকিরণ (radiation)। ১৯০০ সাল পর্যন্ত বিকিরণ বলতে শুধু তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গই বুঝাতো; তন্মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বেতার তরঙ্গ, মাইক্রোওয়েভ, দৃশ্যমান ও অতিবেগুনি আলো। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রঞ্জনরশ্মি ও প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা (natural radioactivity) আবিষ্কৃত হলে এদেরকেও বিকিরণ নামে অভিহিত করা হয়। হাল আমলে এতদ্ব্যতীত পারমাণবিক ও অতিপারমাণবিক কণিকাদি যেমন ইলেকট্রন, বিটা, পজিট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, আলফা ইত্যাদি ও ভারি আয়নসমূহের প্রবাহকেও বিকিরণ নামে অভিহিত

করা হয়। এবার দেখা যাক তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ কি। তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে গভীর সম্পর্ক নিহিত রয়েছে। নিউটন মনে করতেন শূন্যস্থানের ভিতরে অবস্থিত দুই বস্তুকণিকার মধ্যে সংঘটিত পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া তাৎক্ষণিক ও দূরক্রিয়া; বল প্রয়োগে মধ্যবর্তী স্থানের কোনো প্রভাবই নেই অর্থাৎ শূন্যস্থান হচ্ছে অনড়, অবিচল ও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু মাইকেল ফ্যারাডে ধারণা দেন যে, কোনো বস্তুকণিকাকে ঘিরে যে স্থান সেখানেও কণিকাটির অস্তিত্ব ছড়িয়ে থাকে। তড়িৎ ও চুম্বক নিয়ে পরীক্ষালব্ধ ফল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলরেখার ধারণা সৃষ্টি করেন আর তাদের প্রভাববলয়কে ক্ষেত্র বলে অভিহিত করেন। ফ্যারাডের এ সকল ধারণার গাণিতিক রূপই ম্যাক্সওয়েলের বিখ্যাত তড়িৎ-চুম্বকীয় সমীকরণসমূহ, যাতে তড়িৎ-ও চুম্বক-ক্ষেত্র শুধু সমন্বিতই নয়, স্থান ও কালের মধ্যে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন আলোক তরঙ্গরূপেও প্রতিভাত। গামা-রশ্মি, মাইক্রোওয়েভ, বিভিন্ন রঙের আলো, তাপতরঙ্গ, শব্দতরঙ্গ, রেডিও-তরঙ্গ—এ সবই ব্যাখ্যাত বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গরূপ। নানাবিধ এ সকল বিকিরণের মধ্যে একটি সাধারণ ও সর্বব্যাপী মিল হচ্ছে এরা তড়িৎ-চুম্বকীয় ধর্মের। এদের ধরন এক হলেও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বিভিন্ন হওয়ার কারণে গুণাগুণ ভিন্ন। এ কথা সর্বজনবিদিত যে এদের গতিবেগ সর্বক্ষেত্রেই সমান এবং তা নিম্নোক্ত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়,

$$c = n\lambda,$$

যেখানে $c = 3 \times 10^8$ m/s

$n =$ কম্পাঙ্ক,

$\lambda =$ বিকিরণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটারে)।

তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণালী ২.১ চিত্রে দেখানো হল। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পাল্লা (range) ও বিকিরণের ধরন-ধারণ এবং বৈশিষ্ট্য এ চিত্র থেকে বুঝা যায়।

কস্মিক তরঙ্গ	গামা ও রঞ্জন রশ্মি	অতিবেগুনি তরঙ্গ	দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ	অবলোহিত তরঙ্গ	র‍্যাডার তরঙ্গ	বেতার তরঙ্গ
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
10^{-14} মিটার	10^{-6} মিটার	0.2×12^{-6} মিটার	$.4\times10^{-6}$ মিটার	$.8\times10^{-6}$ মিটার	.০২ মিটার	.১-১০০ মিটার

—→ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মি:)

চিত্র ২.১ : তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণালী।

আমাদের চারপাশে ব্যাপ্ত রয়েছে বিকিরণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় বিকিরণের সাগরেই ডুবে রয়েছে এ পৃথিবীর জীবমণ্ডল ও উদ্ভিদকুল। আর

রাতদিন সারাক্ষণ আমাদের দেহ বিকিরণের আঘাত পেয়েই চলেছে। তাই দেখা যায় বিকিরণের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে জীবমণ্ডল। বিকিরণের ব্যবহারও আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। বস্তু থেকে ঠিকরে আসা বিকিরণ আমাদের চোখে সনাক্ত ও বিশ্লেষিত (analysed) হয়, যার ফলে দৃশ্যমান হয় সংশ্লিষ্ট বস্তু আর তখন আমরা একে দেখি। নইলে নিকষ কালো আঁধারে ঢেকে থাকত চারপাশ। সূর্য অথবা অগ্নিশিখা থেকে আগত অবলোহিত বিকিরণ দেহকে উষ্ণ রাখে, মাইক্রোওয়েভে অতি দক্ষ রান্না হয়, দূরদূরান্তে ছবি প্রেরণে সাহায্য করে এবং গাত্রচর্ম বা আশেপাশের পেশী উত্তপ্ত না করেই দেহাভ্যন্তরস্থ নির্ধারিত আহত বা রোগগ্রস্ত গ্রন্থিসন্ধি, পেশী ইত্যাদিকে প্রয়োজনীয় তাপ সরবরাহ করে সুস্থ করে তুলতে পারে (একে বলা হয় diathermy)। বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে যে কোনো দূরত্বে শব্দ পাঠিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। অতিবেগুনি বিকিরণ জীবাণু নাশ করে ও গাত্রচর্মে বাদামীবর্ণ আনয়ন করে। আলোর সাহায্যে ঘাস-বৃক্ষ-তরুলতা আলোক-সংশ্লেষণ (photosynthesis) প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে পুষ্টি আহরণ করে। তাই দেখা যায় বেঁচে থাকার জন্য জীবজগত ও উদ্ভিদকুল কোনো না কোনো ভাবে বিকিরণের উপর নির্ভরশীল।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বৈজ্ঞানিকগণ প্রথম প্রাকৃতিক (natural) তেজবিকিরণের সন্ধান পান। আমাদের চারপাশের মাটি, পানি, বাতাস, ইট, কাঠ, সিমেন্ট বালি, এমন কি জীবদেহ ও খাদ্যেও বিদ্যমান রয়েছে বিকিরণের উৎস (source), যা অনবরত বিকিরণপাত করে চলেছে। এতদ্ব্যতীত মহাশূন্য থেকে আগত অতি উচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট মহাজাগতিক (cosmic) বিকিরণ অহোরাত্র পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলে বর্ষিত হয়ে চলছে।

বিকিরণ ও বস্তুর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলে বিকিরণের শক্তি বস্তুতে স্থানান্তরিত হয় এবং এ শক্তি বিশোষণের মাধ্যমে বস্তুর উত্তেজন ও আয়নায়ন ঘটে থাকে। শক্তির তারতম্য অনুসারে বিকিরণকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা: (১) আয়নায়ক (ionizing) বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ; (২) অনায়নক (nonionizing) বা অতেজস্ক্রিয় বিকিরণ। অনায়নক বিকিরণকে উত্তেজক (exciting) বিকিরণও বলা হয়। আয়ন বলতে ধনাত্মক বা ঋণাত্মকভাবে তড়িতাহিত কণিকা বুঝায়। পরমাণু সাধিকভাবে তড়িৎ-নিরপেক্ষ (electrically neutral) থাকে। বিকিরণের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় শক্তি বিশোষণ করে পরমাণু উত্তেজিত হয়। শক্তি বিশোষণের মাত্রা যদি এমন হয় যে পরমাণুর কক্ষস্থ ইলেকট্রন ছুটে বেরিয়ে আসে তাহলে পরমাণুটির তড়িৎ-নিরপেক্ষতা আর থাকে না; খসে-পড়া ইলেকট্রন

আর ধনতড়িতাহিত অবশিষ্ট পরমাণু মিলে আয়নজোড়া সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়াকেই আয়নায়ন বলা হয়। আয়নায়ন ঘটাতে সক্ষম এমন সর্বনিম্ন পরিমাণ ক্ষমতাসম্পন্ন বিকিরণকে আয়নায়ক বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বলা হয় আর তদপেক্ষা কম শক্তি-ধর বিকিরণকে অনায়নক বা অতেজস্ক্রিয় বিকিরণ বলা হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পূর্বোল্লিখিত যে বিকিরণের সন্ধান মিলে তা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ আর ইহা প্রায় সর্বব্যাপী এবং সার্বক্ষণিক ঘটনা; এ থেকেই উৎসারিত হয় নৈসর্গিক পটভূমি বিকিরণ ডোজ (natural background dose)। এ নৈসর্গিক পটভূমি বিকিরণ, নানাবিধ উৎস হতে উৎসারিত হয় যথা: সূর্যকিরণ, শিলা, মাটি, বসবাসের দালান-কোঠা, শ্বাস-প্রশ্বাসে গৃহীত বাতাস, গৃহীত খাদ্য ও পানীয় এমনকি আমাদের দেহও কতকাংশে তেজস্ক্রিয় বটে। আর মহাশূন্য থেকে আগত মহাজাগতিক বিকিরণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই স্পষ্টতই দেখা যায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রধান উৎস প্রকৃতি এবং আমাদেরই চারপাশের এই পরিবেশ। এসব বিকিরণের অনেকগুলিই পৃথিবী সৃষ্টির আদি থেকেই বিরাজমান। মানুষও তাদের নানাবিধ কার্যক্রমের দ্বারা বিকিরণ সৃষ্টি করে চলেছে এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহণ, স্থানান্তরণ ও নাড়াচাড়ার মাধ্যমে বিকিরণপাত তথা ডোজ বাড়িয়ে চলেছে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কতিপয় কারণ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমেই আসে আবদ্ধ জায়গায় অর্থাৎ গৃহে বাসের কারণ। ইট, শিলা, পাথর, সিমেন্ট, কংক্রীট ইত্যাদিতে দীর্ঘজীবী তেজস্ক্রিয় উপাদান ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম রয়েছে। এরা আবার নিজেরা অনুক্রমিকভাবে ক্ষয় হয়ে অপর তেজস্ক্রিয় উপাদানে রূপান্তরিত হয়। এ তেজস্ক্রিয় অনুক্রমগুলির প্রত্যেকেরই একটি করে তেজস্ক্রিয় গ্যাস-সদস্য হচ্ছে রেডন। উৎসারিত রেডন গ্যাস আবদ্ধ জায়গায় সঞ্চিত হয়ে ব্যাপকভাবে বাহ্যিক (external) ও অভ্যন্তরীণ (internal) বিকিরণপাত ঘটাচ্ছে। সীমিত বায়ু সঞ্চালনের ফলে গৃহে রেডন গ্যাসের গাঢ়ত্ব (concentration) বেড়ে যায়। এতদ্ব্যতীত তেজস্ক্রিয় পটাশিয়াম-৪০ সহ প্রায় ৫৫টি তেজস্ক্রিয় উপাদান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে পরিবেশস্থ বস্তুনিচয়ে। এক হিসাবে জানা গেছে, দেহে সংঘটিত মোট বিকিরণপাতের শতকরা ৭৮ ভাগই আসে এসব প্রাকৃতিক উৎস থেকে।

দেহে বিকিরণপাতের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে বিকিরণের চিকিৎসাগত প্রয়োগ। বিকিরণলেখ (radiography), টোমোগ্রাফী (tomography), ক্যান্সার থেরাপি ইত্যাদিতে রঞ্জনরশ্মির ব্যাপক প্রয়োগ প্রচলিত

আছে। তেজস্ক্রিয়তা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিউক্লিয়ার মেডিসিনে সারা দুনিয়ায় ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশেও প্রধান প্রধান চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে পারমাণবিক চিকিৎসা শাখা খোলা হয়েছে। মোট তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের শতকরা প্রায় ২১ শতাংশ চিকিৎসাজনিত সূত্র থেকে আসে।

স্বল্প পরিমাণ আরো কিছু বিকিরণপাত ঘটে নানা উপায়ে। পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে যতই উপরে যাওয়া যায় ততই আবহাওয়ামণ্ডলজনিত আবরণী (shielding) হ্রাস পায়, ফলে কসমিক বা মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে উৎসারিত বিকিরণপাত বাড়তে থাকে। আকাশ ভ্রমণে তাই বিকিরণপাত বাড়ে। তেজস্ক্রিয় ভস্মপাত (fallout) খাদ্য ও পানীয়ে বিকিরণদুষ্টি ঘটায়। অনেক শিল্প-কারখানা অন্যভাবে আবদ্ধ (otherwise locked-in) তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরিবেশে ছড়িয়ে থাকে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য কয়লার ব্যবহার। সার কারখানা, খনিজ আহরণ ও নির্মাণ কারখানাও এ ব্যাপারে কম যায় না।

সচরাচর সংঘটিত স্বল্প বিকিরণপাতের উৎস হচ্ছে পুরাতন কিছু কিছু প্রতিপ্রভ (luminescent) ঘড়ি, কম্পাস, রঞ্জক পদার্থ, রঙ, প্রবেশ ও নির্গমন পথের সাইনবোর্ড (exit and entrance signs) ইত্যাদি। অগ্নিকাণ্ডে সতর্কীকরণ (fire alarm), ধোঁয়া নির্ণায়ক (smoke detector), টেলিভিশন সেট, পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র এবং শিল্প ও কৃষিখাতে গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকেও খুবই স্বল্পমাত্রায় বিকিরণপাত ঘটে থাকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কোনো কোনো বিকিরণ সুদূরপ্রসারী ও প্রবেশ্য হলেও বস্তুগর্ভে বিশোষণের মাধ্যমে এরা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

জীবদেহে বিকিরণের প্রভাব

বিকিরণপাত জীবদেহে সামান্য চুলপড়া থেকে শুরু করে জীবনসংহারী ক্যান্সার-সহ নানাবিধ মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপরও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ছাপ রাখে। ক্ষতির ধরন ও পরিমাণ বিকিরণের ধরন ও শক্তির উপর নির্ভরশীল। আমরা জানি, শক্তির হিসাবে বিকিরণকে মূলত দুটি প্রধান দলে ফেলা হয়, যথা: (১) আয়নায়ক বা তেজস্ক্রিয় বিকিরণ; এবং (২) অনায়নক বা অতেজস্ক্রিয় বিকিরণ। প্রথমে জীবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের প্রভাব এবং পরে অতেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের কথা আলোচনা করা হবে।

৩.১ জীবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের প্রভাব

জার্মান পদার্থবিদ রংটগেন কর্তৃক ১৮৯৫ সালের ৮ নভেম্বর এক্স-রে আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই এক্স-রে ব্যবহার করে তাঁর তোলা জীবন্ত মানুষের হাড়গোড়ের স্পষ্ট ছবি দেখে বেশ কয়েকজন সৃজনশীল চিকিৎসাবিদের মনে চিকিৎসাশাস্ত্রে এর সফল প্রয়োগের ভাবনা জাগে। সেই ভাবনা থেকেই তাঁরা রোগী, সহকর্মী ও তাঁদের পরিবারবর্গের এক্স-রে এর সাহায্যে ছবি নিয়ে হাড়ের গঠনবৈচিত্র্য পরীক্ষা করতে লেগে যান। তদবধি চিকিৎসাশাস্ত্রে এক্স-রে ব্যবহারের যে যাত্রা শুরু হয় তা আর থামে নি। আর থামেনি যে তা-তো আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। চিকিৎসকের কাছে গেলেই হলো, তা পেটের ব্যথাই হোক, হাড় ভাঙ্গাই হোক, পিঠের ব্যথাই হোক—এমনি যা কিছু গোলেযোগই দেহে ঘটুক না কেন চিকিৎসক বলবেন, 'অমুক-তমুক অঙ্গের এক্স-রে করে নিয়ে আসুন প্রথমে। তারপর দেখব আপনার অসুখটা কোথায় আর দাওয়াই-ই বা কি।' কিন্তু এত যে উপকারী এক্স-রে তাও নিরীহ নয় মোটেই। আবিষ্কারের চার মাস যেতে না যেতেই যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যাণ্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ ডানিয়েল প্রথম লক্ষ্য করেন যে এক্স-রে জীবকোষে বিবর্তন আনয়ন করে। জনৈক সহকর্মীর মাথার খুলির এক্স-রে গ্রহণের অব্যবহিত পরেই চুল পড়া থেকে তিনি এ ধারণা লাভ করেন। ডানিয়েলের এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন পড়ে ভিয়েনার তরুণ চিকিৎসক ডাঃ লিওপোল্ড ফ্রয়েণ্ড এক্স-রে এর ক্ষমতাকে

রোগ নিরাময়ের কাজে লাগাতে শুরু করেন। এর দ্বারা লোমশ জন্মদাগ, আঁচিল, মেচতা ও চামড়ার অন্যান্য অস্বাভাবিকতা সারিয়ে ফেলা শুরু হয়। ১৮৯৯ সালে সুইজারল্যাণ্ডের দুই চিকিৎসক স্টেনবেক ও সগরীন জনৈক রোগীর নাকের ডগার ক্যান্সার এক্স-রে প্রয়োগে নিরাময় করে দেন।

রোগ নিরাময়ে এক্স-রে ব্যবহারের প্রায় ক্ষেত্রেই কিন্তু ক্ষতিকর ফলোদয় হতে লাগল। এর ক্ষতিকর প্রভাবের খবর উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। ১৮৯৭ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক্স-রে জার্নালের প্রথম সংখ্যায় পৃথিবীর নানা দেশের বিভিন্ন গবেষণাগার ও চিকিৎসালয়ে সংঘটিত ৬৯টি এক্স-রে সংক্রান্ত ক্ষতির প্রতিবেদন ছাপা হয়। এক্স-রে বিকিরণপাত প্রাপ্ত বহু রোগীর চামড়া লাল রঙ ধারণ করে। প্রথম দিকে রোগীদের এক্স-রে গ্রহণকালে হাত দিয়ে এক্স-রে প্লেট ধরে রাখতে হত। যে-সব চিকিৎসক এ কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের হাতের চামড়া লালচে হয়ে যায়। দীর্ঘদিন কাজ করার পর অনেকের হাতে ফোস্কা পড়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। অনেকের বেলায় ক্যান্সার হয়, যা পরবর্তীকালে সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে এবং অকালমৃত্যু ঘটায়।

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে এক্স-রে আবিষ্কারের অল্প কিছুদিন পরই ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী বেকারেল ইউরেনিয়াম যৌগে তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পান। তার দু'বছর পরই ১৮৯৮ সালে কুরি দম্পতি পিচব্লেণ্ড থেকে তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম নিষ্কাশনে সক্ষম হন।

এক্স-রে বিকিরণপাতে স্পষ্টত দৈহিক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্বেচ্ছায় কি দুর্ঘটনাজনিত কারণ, হোক না কেন, এক্স-রে গ্রহণ চলতেই থাকে। অধিকন্তু ১৯২০ সালের দিকে বাত, সিফিলিস, মানসিক ব্যাধি ইত্যাকার অসুস্থতায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ ধন্বন্তরী ঔষধরূপে প্রয়োগ করা হতে থাকে। এর কারণ তেজস্ক্রিয়ার প্রভাবে এ সকল রোগ প্রথম-বারের মতো সহজেই সেরে গিয়ে দেহকে চাঙ্গা করে তুলত। কিন্তু পরবর্তীকালে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ফলে রোগীর অবস্থা আরো সঙ্গিন হয়ে পড়ত।

রেডিয়াম আবিষ্কারের অব্যবহিত পর এর তেজস্ক্রিয়াকেও রোগ নিরাময়কারী ও প্রাণদায়ী উপায় হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। ফলে Radium Schwach Therapie ও Radium Beineologie ইত্যাকার নানাবিধ ঔষধের উদ্ভব হয়। কথিত আছে, তৎকালে জন বার্ড নামে জনৈক ধনাঢ্য আমেরিকান শক্তিবর্ধনে সহায়ক মনে করে তেজস্ক্রিয় পানীয় গ্রহণ করতে থাকেন। ফলে অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়তাজনিত দূষণ ঘটে তিনি অকালে মারা যান। অকস্মাৎ মৃত্যুর কারণ

উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তেজস্ক্রিয়তার বিরূপ প্রভাবের কথা জানা যায়। তাছাড়া সুইজারল্যাণ্ডের রেডিয়াম ডায়ালওয়ালা পরপ্রভ ঘড়ি পেইণ্টারদের তেজস্ক্রিয়তা-দূষণ এবং তদ্দরুন হাড়ের ক্যান্সারে অকালমৃত্যুর ঘটনা সর্বজনস্বীকৃত ও পরীক্ষিত। রেডিয়াম দ্বারা ঘড়ির ডায়াল পেইণ্ট করার সময় পেইণ্টারগণ জিভের অগ্রভাগ ও ঠোঁট দ্বারা রেডিয়ামসিক্ত তুলির অগ্রভাগ সূঁচালো করতে গিয়ে প্রতিবারই অতি লেশ-মাত্রায় রেডিয়াম গলাধঃকরণ করতেন। দীর্ঘদিন কাজের ফলে এভাবে গলাধঃকৃত তেজস্ক্রিয় রেডিয়ামের পরিমাণ বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে রেডিয়াম দেহের বিপাকক্রিয়ার ফলে হাড়ে সঞ্চিত হয়ে থাকে আর এর ফলে হাড়ের ক্যান্সার সৃষ্টি হয়। জানা গেছে, জনৈক দন্ত চিকিৎসক এক রেডিয়াম ডায়াল পেইণ্টারের চোয়ালের হাড়ের ক্যান্সারের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখতে পান যে উক্ত পেশায় নিয়োজিত প্রায় সকলেরই হাড় ও চোয়ালের ক্যান্সার হয়েছে এবং অনেকের অকালমৃত্যু ঘটেছে। ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরবর্তীকালে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে তেজস্ক্রিয় রেডিয়ামের প্রভাবেই এ ধরনের হাড়ের ক্যান্সার এবং অকালমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

এবার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের কথায় ফিরে আসা যাক। যে ধরণের শক্তিধর বিকিরণ বস্তুর সাথে মিথস্ক্রিয়ায় বস্তুতে আয়নায়ন ঘটাতে পারে তাকেই তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নামে অভিহিত করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে কোনো গ্যাসীয় পদার্থে আয়নায়নের জন্য পরমাণুস্থ ইলেকট্রনকে গড়ে 34 eV শক্তি সরবরাহ করতে হয়। সুতরাং গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের শক্তি ন্যূনপক্ষে 34 eV হতে হবে। এ প্রসঙ্গে eV এর ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। ১ ভোল্ট বিভব ব্যবধানের ভিতর চলতে গিয়ে কোনো ইলেকট্রন যে পরিমাণ শক্তি লাভ করে তা-ই ১ ইলেকট্রন ভোল্ট (eV) শক্তি ($1eV = 1.6\times10^{-6}$ erg)।

দেহের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেহে শক্তি স্থানান্তরিত করে ক্রমশ নিঃশক্তি হতে থাকে। দেহের অণু-পরমাণু তথা কোষকলা প্রাপ্ত এ শক্তি বিশোষণ করে নিতে থাকে এবং সন্নিহিত কোষ-কলায়ও স্থানান্তরিত করে। ফলে জীবকোষ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা সারাদেহে এর প্রভাব বিস্তার লাভ করে। তাই জীবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব জানতে হলে দেহস্থ অণু-পরমাণু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, কোষকলা ইত্যাদির উপর এদের বিক্রিয়ার ফলাফল ও প্রভাব সম্পর্কে পূর্বাহ্নেই অবহিত হওয়া এবং সম্যকভাবে বিবেচনায় আনা প্রয়োজন। সাধারণত মানবেতর প্রাণীর উপর বিকিরণপাত ঘটিয়ে প্রাপ্ত ফলাফল মানুষের বেলায়ও খাটানো হয়ে থাকে। কিন্তু এভাবে সর্বাংশে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

কারণ মানুষ অনেক উচ্চস্তর জীব। দৈহিক ও বিপাকীয় বৈশিষ্ট্যে মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কোষকলার গঠনেও অনেক গরমিল। তাই মানবেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে যা ঘটে মানুষের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে বিশোষিত শক্তি অণু-পরমাণুর গঠনে পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং বৈদ্যুতিক ভারসাম্যসহ অপরাপর সকল ভারসাম্য বিনষ্ট করে সাবিকভাবে বেসামাল করে তোলে। প্রভাবাধীন অণুটি যদি জীবকোষের তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা উপাঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সম্পাদনে নিয়োজিত থেকে থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট কাজ দারুনভাবে ব্যাহত হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জননকোষ (gonad) আহত বা নষ্ট হয়ে গেলে প্রজননক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। বিকিরণ-প্রভাবিত কোষের মৃত্যু ঘটলে তদ্‌কর্তৃক সম্পাদিত কাজ বন্ধ হওয়ার ফলে প্রাণীদেহে বৈকল্য দেখা দেওয়া বিচিত্র কিছু নয়। আর কোষটির মৃত্যু না ঘটে সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এমনও হতে পারে যে তার বিভাজন অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে; তখন উক্ত কোষটি অবিরত বিভাজিত হয়ে টিউমারের সৃষ্টি করতে পারে যার শেষ পরিণতি হতে পারে প্রাণঘাতী ক্যান্সার। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মানবদেহে মাত্র ৫'গ্রে' (৫০০ রেড) গামা-বিকিরণ বিশোষিত হলে ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু অবধারিত হয়ে পড়ে, অথচ তদ্দরুন দেহের তাপমাত্রা বাড়ে এক ডিগ্রি সেলসিয়াসের এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এ প্রসঙ্গে 'গ্রে' ও রেড-এর ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো। 'গ্রে' হচ্ছে অতি সম্প্রতি চালু আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতিতে [International System Uuit (S.I)] বিশোষিত তেজস্ক্রিয় ডোজের (absorbed dose) একক। প্রতি কিলোগ্রাম বস্তুতে ১ জুল শক্তি বিশোষিত হলে তা ১ 'গ্রে' বিশোষিত ডোজ ধরা হয়। এর সনাতন একক হচ্ছে Rad (radiation absorbed dose, সংক্ষেপে rad) যা প্রতি গ্রাম বস্তুতে ১০০ আর্গ বিশোষিত শক্তির মাত্রা বুঝায়।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের দরুন জীবদেহে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দু'ধরনের প্রভাবই উদ্ভূত হতে পারে। প্রত্যক্ষ প্রভাবের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত কোষটির মৃত্যু ঘটতে পারে অথবা তা সাময়িক পরিবর্তনের শিকার হতে পারে যা সময়ের সাথে সেরেও যেতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে প্রায় ক্ষেত্রেই তা দৈহিক (somatic) এবং প্রজননজনিত বিবর্তন রূপে দেখা দেয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বিকিরণপাতের দরুন উদ্ভূত আপদ ও রোগব্যাধি নিয়ে অদ্যাবধি যত গবেষণা হয়েছে এবং যত বেশি তথ্যাদি জানা গেছে তত্টা আর কোনো রোগব্যাধি ও আপদ-উৎপাদী উৎস বা এজেন্ট নিয়ে হয়নি। বিকিরণপাত

উদ্ভূত বিষয়ে এত বেশি ও সঠিক তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে যে বিকিরণপাত সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি প্রয়োগের দরুন পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ সৃষ্ট আপদ-বালাইয়ের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণ পূর্বাহ্নেই আঁচ করা সম্ভব। ফলে যথাযথ নিরোধ ও প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করাও সহজ।

এবার দেখা যাক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবসমূহ কি কি।

প্রত্যক্ষ প্রভাব

বিকিরণপাতের দরুন জীবদেহে সংঘটিত ক্রিয়া-বিক্রিয়া ও উদ্ভূত ফলাফল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। দেখা গেছে উদ্ভূত পীড়াগুলি সাধারণত অতি নগণ্য সংখ্যক পরমাণুর আয়নায়ন বা উত্তেজনের ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। ৫ গ্রে গামা-রশ্মিপাতে ১ কিলোগ্রাম দেহ কোষে সৃষ্ট আয়নজোড়ার সংখ্যা

$$N = \frac{5Gy \times 6.25 \times 10^{18}\ eV\ kg^{-1}\ Gy^{-1}}{34\ eV/ion} = 9.2 \times 10^{18}\text{টি}।$$

উপরিউক্ত প্রতিটি আয়নজোড়া তদ্‌পার্শ্বস্থ আরো ৯টি পরমাণুকে প্রভাবিত করতে পারে। তাহলে দেখা যায় প্রতি কিলোগ্রাম দেহকোষে প্রায় ৯.২×১০^{১৮}টি পরমাণু প্রভাবিত হয়ে থাকে। এখন, প্রতি কিলোগ্রাম দেহকোষে রয়েছে প্রায় ৯.৫ × ১০^{২৫}টি পরমাণু। এমতাবস্থায় সরাসরি প্রভাবিত পরমাণুর অনুপাত দাঁড়ায়

$$\frac{৯.২ \times ১০^{১৮}}{৯.৫ \times ১০^{২৫}} \approx ১ \times ১০^{-৭}\text{টি}$$

অর্থাৎ প্রতি ১০ মিলিয়ন পরমাণুতে ৫ গ্রে বিকিরণপাতের ফলে সর্বসাকুল্যে একটিমাত্র দেহ-পরমাণু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, অথচ তদ্দরুন বিকিরণাহত ব্যক্তির মৃত্যু প্রায় অবধারিত হয়ে থাকে। বিকিরণপাতে DNA অণুর কোনো পরমাণু বা বন্ধন বিযুক্ত হয়ে গেলে তাতে বিদ্যমান তথ্যাদি সন্তান-সন্ততিতে বর্তায় না; ফলে point mutation ঘটে থাকে।

পরোক্ষ প্রভাব

বিকিরণপাতের ফলে উদ্ভূত আয়নায়ন বা উত্তেজন কোনো অণু বা পরমাণুতে সরাসরি কিভাবে সংঘটিত হয় তা আজো সুনির্ধারিতরূপে জানা যায়নি। কিন্তু সরাসরি অণু বা পরমাণুটি যদি কোনো আমিষের অংশ অথবা ডিএনএ (DNA)-এর অন্তর্গত হয় তবে তদ্দরুন সুনির্ধারিত প্রভাব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দেহ অতিক্রমকালে দেহের অণু-পরমাণুতে সমভাবে শক্তি স্থানান্তর ঘটে না—ঘটে অনেকটা থোকায় থোকায়। স্থানান্তরিত শক্তির বিস্তারও সমভাবে ঘটে না। স্থানান্তরিত শক্তি, শক্তির স্থানীয়ভাবে বণ্টন তথা বিস্তারের উপর তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের প্রভাব নির্ভর করে বহুলাংশে। তাছাড়া স্থানান্তরিত শক্তির প্রভাববৈশিষ্ট্য জীবকোষে বিদ্যমান উপাদানের উপরও নির্ভরশীল। প্রতিটি দেহকোষে রয়েছে পানি (প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ) আর বহুবিধ জৈব পদার্থ যেমন শ্বেতসার, স্নেহ পদার্থ, আমিষ, DNA, RNA ইত্যাদি; বহুল পরিমাণে বিদ্যমান উপাদানসমূহ হচ্ছে অক্সিজেন (৬৫%), কার্বন (১৮%), হাইড্রোজেন (১০%), নাইট্রোজেন (৩%), ক্যালসিয়াম (১৫%), ফসফরাস (১%), সালফার (০.২৫%) পটাশিয়াম (০.২%), সোডিয়াম ০.১৫%), ক্লোরিন (০.২৫%) ও ম্যাগনেসিয়াম (০.০৫%)। আরো কিছু উপাদান রয়েছে ট্রেস (trace) মাত্রায়। যেহেতু দেহের বেশিরভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে পানি, তাই বিকিরণপাতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত পানির অণুগুলো যা সহজেই দেহের অন্যস্থানেও সঞ্চারিত হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই বিকিরণপাতের ফলে পানির অণু আয়নিত হয়ে সৃষ্টি করে অতীব বিক্রিয়াশীল মুক্ত যৌগমূলক (আধানবিশিষ্ট পরমাণুগুচ্ছ যেগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটি মাত্র পরমাণুর ন্যায় আচরণ করে থাকে)। এরা মুক্ত আয়ন বিধায় অতি সহজেই নিকটস্থ অপরাপর অপ্রভাবিত অণুতেও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাত পানির স্বাভাবিক অণুতে নিম্নোক্ত পরিবর্তন ঘটায়:

$$H_2O \rightarrow H_2O^+ + e^- \text{ (ইলেকট্রন)} \qquad (৩.১)$$

উদ্ভূত H_2O^+ আয়নটি তৎক্ষণাৎ বিযুক্ত হয়ে নিম্নরূপ উৎপাদ প্রদান করে

$$H_2O^+ \rightarrow H^+ + OH^0 \text{ (যৌগমূলক)} \qquad (৩.২)$$

সমীকরণ ৩.১ অনুসারে সৃষ্ট ইলেকট্রনটিও সাথে সাথেই কোনো তড়িৎ-নিরপেক্ষ পানির অণুর সাথে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে

$$e^- + H_2O \rightarrow H_2O^- \qquad (৩.৩)$$

H_2O^- তখন বিযুক্ত হয়

$$H_2O^- \rightarrow OH^- + H^0 \qquad (৩.৪)$$

সমীকরণ ৩.২ ও ৩.৪ এ প্রদর্শিত যৌগ মূলকসমূহ পরস্পর নিজেদের মধ্যে অথবা অপরাপর অণুর সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর পদার্থের জন্ম দেয়, যেমন:

$$OH^0 + OH^0 \rightarrow H_2O_2 \qquad (৩.৫)$$

$$H^{\circ} + O_2 \rightarrow HO_2 \qquad (৩.৬)$$

এবং $$HO_2 + H \rightarrow H_2O_2 \qquad (৩.৭)$$

যৌগমূলকগুলি রাসায়নিকভাবে উচ্চমাত্রায় বিক্রিয়াশীল ও বেশ কিছুকাল ধরে স্থিত থাকে বিধায় বিক্রিয়াস্থল থেকে দূরবর্তী স্থানেও ছড়িয়ে পড়ে এবং বিকিরণপাতে সরাসরি প্রভাবিত হয়নি এমন অণু-পরমাণুতেও প্রভাব বিস্তার করে।

অতএব দেখা যায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাত দুইভাবে জীবদেহে প্রভাব বিস্তার করে, যথা: (১) সরাসরি আয়নায়ন দ্বারা অণুর বিযুক্তি ঘটিয়ে এবং (২) দেহস্থ তরল পদার্থে যৌগমূলক ও উচ্চ বিক্রিয়াশীল হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড সৃষ্টি করে।

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাত মানবদেহে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। ফলে অত্যাবশ্যকীয় অণুসমূহের রাসায়নিক বিবর্তন ঘটে এবং পরবর্তীতে সেগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে দেহের বিপাকক্রিয়া ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। জীবকোষের ডিএনএ (DNA) ও নিউক্লিয়াস প্রভাবিত হলে কোষটির মৃত্যু ঘটাই স্বাভাবিক।

বিকিরণপাত প্রাপ্ত দেহের পরিণতি

দেহে বিকিরণপাতের প্রভাবের ধরন-ধারণ ও পরিমাণ নির্ভর করে বিকিরণপাত-কালে দৈহিক অবস্থা (Physiology), বয়স তথা তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ধরন, পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি এবং সর্বোপরি দেহের কোন অঙ্গে বা কত অংশে বিকিরণপাত ঘটছে তার উপর। কারণ শরীরের কোনো কোনো অঙ্গ যেমন জননেন্দ্রিয় (gonad), সারাদেহে সমভাবে বিকিরণপাতের ফলে (wholebody uniformly irradiated), বিকিরণের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদী বলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সর্বাধিক।

সাধারণত দু'ধরনের বিকিরণপাত ঘটতে দেখা যায়, যথা: (১) স্বল্প সময় ধরে একবারে বেশি মাত্রায় বিকিরণপাত, যাকে তীব্র বিকিরণপাত (acute exposure) বলা হয়। এ ধরনের বিকিরণপাত পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ, পারমাণবিক চুল্লির দুর্ঘটনা বা অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ গ্রহণ থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকে। (২) দ্বিতীয় প্রকারের বিকিরণপাতটি ঘটে অতি অল্প অল্প করে দীর্ঘকাল ধরে, যা দীর্ঘমেয়াদী বিকিরণপাত (chronic exposure) বলে পরিচিত। যথাযথ নিরাপত্তা ও নিরোধমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ না করলে পরমাণু-শক্তি প্রতিষ্ঠান, হাস-পাতালের রেডিওলজি বা রেডিওথেরাপি বিভাগে ও ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম ইত্যাদি খনিজ তেজস্ক্রিয় বস্তু আহরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিকিরণ

কর্মীদের এবং যেসব রোগীর বার বার এক্স-রে গ্রহণ করা হয় তাদের মধ্যে সাধারণত দীর্ঘকালীন (chronic) বিকিরণপাত ঘটে।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে অথবা অল্প সময় পরে দেখা দিতে পারে অথবা প্রারম্ভিক পরিবর্তন ঠিক হয়ে যাওয়ার পরেও বিলম্বে কিছু কিছু প্রভাব দেখা দিতে পারে। প্রথমোক্তটিকে বলে বিকিরণপাতের আসন্ন প্রভাব (early effect) আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় বিলম্বিত প্রভাব (delayed effect)। সাধারণত তীব্র বিকিরণপাতের অব্যবহিত পরেই আসন্ন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আর যে সকল ব্যক্তি অল্প অল্প তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাত দীর্ঘকাল ধরে পেয়ে থাকে তাদের মধ্যে বিলম্বিত প্রভাব ঘটতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ (সুইজারল্যান্ডের) ঘড়ির রেডিয়াম ডায়াল পেইণ্টারদের হাড়ের ক্যান্সারের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের আসন্ন প্রভাবসমূহ

যেহেতু তীব্র বিকিরণপাতের দরুনই আসন্ন প্রভাবসমূহ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে তাই মানুষের মধ্যে তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়, কেননা কেবলমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনেই মানুষকে তীব্র বিকিরণপাত প্রদান নিতান্তই অমানবিক, অযৌক্তিক ও নীতিবিরুদ্ধ। তজ্জন্য জীব-জানোয়ারের উপর তীব্র বিকিরণপাত ঘটিয়ে অনুরূপ বিকিরণপাতে মানুষের ক্ষেত্রে কি ঘটবে তা অনুমান করা যেতে পারে। তবে যেহেতু দৈহিক ও বিপাকীয় পার্থক্য দুস্তর, তাই পরিলক্ষিত ফলাফল মানুষের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য হতে পারে না। অবশ্য তীব্র তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের জন্য মানুষকে ব্যবহার করা না গেলেও দুর্ঘটনায় বিকিরণপাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণে রেখে ফলাফল জানা যেতে পারে। যেমন হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমার শিকার মানুষদের এবং সময় সময় পারমাণবিক চুল্লি ও অন্যান্য পারমাণবিক দুর্ঘটনায় হতাহতদের দীর্ঘমেয়াদী পর্যবেক্ষণ থেকে কি পরিমাণ বিকিরণপাত দেহে কি ধরনের রোগ-লক্ষণাদির (disease syndromes) উদ্ভব করে ও ক্ষতি সাধন করে তা জানা গেছে। দেখা গেছে, ব্যক্তিবিশেষ ৩—৪ 'গ্রে' (৩০০—৪০০ র‍্যাড) তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাত সারা দেহে সুষমভাবে পেলে তার মৃত্যুর সম্ভাবনা শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি হয়ে থাকে।

সারা দেহে তীব্র বিকিরণপাত ঘটলে দেহের সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সিস্টেমই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সকল অঙ্গ ও সিস্টেম যেহেতু সমান সংবেদী নয়, তাই সমপরিমাণ বিকিরণপাতেও সকলের দেহে বা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ও সিস্টেমে

সমান বা একই রোগ-লক্ষণাদি দেখা দেয় না। রক্ত-উৎপাদী (blood-forming) অঙ্গাদিই সর্বাপেক্ষা সংবেদী অঙ্গ।

তীব্র বিকিরণপাতের উদ্ভূত রোগ-লক্ষণাদিকে ক্ষতির ক্রমবর্ধমান তীব্রতার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা :

(১) রক্ত উৎপাদনতন্ত্র (hemopoietic) ব্যাহত হয় এমন রোগ-লক্ষণপুঞ্জ;
(২) পাকান্ত্রিক (gastro-intestinal) রোগ-লক্ষণপুঞ্জ; এবং
(৩) কেন্দ্রীয় স্নায়ুতান্ত্রিক (central nervous system) রোগ-লক্ষণপুঞ্জ।

উপরিউক্ত রোগলক্ষণপুঞ্জের সাথে নিম্নোক্ত প্রভাবাদিও সচরাচর বিদ্যমান থাকে :

(ক) বমনেচ্ছা, বমি ও অরুচি;
(খ) অস্বস্তি, অস্বাচ্ছন্দ্য, অবসন্নতা, নিদ্রালুতা ইত্যাকার শারীরিক অসুস্থতা;
(গ) বর্দ্ধিত দৈহিক তাপমাত্রা; এবং
(ঘ) রক্তের গুণগত মান পরিবর্তন।

এর সঙ্গে অন্যান্য বহুবিধ প্রভাবও লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রথমেই রক্তের পরিবর্তনাদি নিয়ে আলোচনা করা হলো।

রক্তে আবিষ্ট পরিবর্তন (changes induced in blood)

উল্লিখিত প্রভাব চতুষ্টয়ের মধ্যে বিকিরণপাতের সর্বাধিক সংবেদী জৈবিক নির্দেশক (bioindicator) হচ্ছে রক্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত পরিবর্তনসমূহ। দেখা গেছে স্বল্পমাত্রার বিকিরণপাতেও (০.২৫—০.৫০ গ্রে) রক্তের পরিবর্তনাদি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। এবার দেখা যাক, রক্তে কি কি উপাদান রয়েছে। রক্তের শতকরা ৫৫ ভাগ রক্তরস (plasma) আর বাকি শতকরা ৪৫ ভাগে রয়েছে শ্বেত কণিকা (white blood cell, W.B.C. 7,000/mm^3), লোহিত কণিকা (red blood cell, R.B.C. 5,000/mm^3) এবং অণুচক্রিকা (platelet, 2,00,000—4,00,000/mm^3)। শ্বেত কণিকাসমূহ দেহকে রোগ সংক্রমণ থেকে মুক্ত রাখার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, লোহিত কণিকাসমূহ দেহকোষে পুষ্টি উপাদান ও অক্সিজেন বয়ে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে বর্জ্য ফুসফুসে নিয়ে আসে বের করে দেওয়ার জন্য আর অণুচক্রিকাসমূহ দেহে কোথায়ও কেটে বা ফেটে গিয়ে রক্ত পড়তে থাকলে তথায় রক্ত জমাট বাধায় সহায়তা করে; অন্যথায় রক্তপাতের ফলে দেহ রক্তশূন্য হয়ে জীবনাশংকা সৃষ্টি হবে।

বিকিরণপাত রক্তের শ্বেত কণিকায় তাৎক্ষণিক বড় ধরনের পরিবর্তন আনয়ন করে যার ফলে দেহের প্রতিরক্ষাব্যূহ পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে; অণুচক্রিকার সংখ্যাও দ্রুত

হ্রাস পেতে থাকে এবং এক মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। অতঃপর আবার ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে; পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে কয়েক মাস ও সময় লেগে যেতে পারে।

এবার দেখা যাক কি পরিমাণ বিকিরণপাত উপরিউক্ত রোগ-লক্ষণাদি (disease syndrome) সৃষ্টি করে।

রক্ততন্ত্রের রোগলক্ষণপুঞ্জ (hemopoietic syndrome)

২ গ্রে (২০০ র‍্যাড) গামা-রশ্মিপাতে রক্ততন্ত্রের রোগলক্ষণপুঞ্জ দেখা দেয়। এ রোগে রক্ত-উৎপাদী হাড়মজ্জা (bone marrow) অবদমিত হয় বা মুছে যায়, যদ্দরুন রক্ত-উৎপাদন ব্যাহত হয়। অরুচি, বমনেচ্ছা, বমি, অবসন্নতা, অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ ইত্যাদি দেখা দেয়। কোনো জনগোষ্ঠী ৪—৬ গ্রে (৪০০-৬০০ র‍্যাড) বিকিরণপাত পেলে ৩০ দিনের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনের মৃত্যুর উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। এ ডোজের বিকিরণপাত গড় প্রাণনাশক ডোজ (mean lethal dose, LD) নামে পরিচিত। এই মাত্রাকে সংক্ষেপে LD—50/30 রূপে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

পাকান্ত্রিক (gastro-intestinal) রোগলক্ষণপুঞ্জ

৫ গ্রে (৫০০ র‍্যাড) বা তদূর্দ্ধ গামা-রশ্মিপাতে পাকস্থলী ও অন্ত্রের রোগলক্ষণপুঞ্জ প্রকাশ পায়। ডায়রিয়া, রক্তপাত, বমি, ইত্যাদি শুরু হয়।

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতান্ত্রিক (central nervous system, CNS) রোগলক্ষণপুঞ্জ

৮—১০ গ্রে (৮০০-১,০০০ র‍্যাড) গামা বিকিরণপাতে মস্তিষ্ক ও কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কর্মক্ষমতা লোপ পায়, চেতনাশক্তি রহিত হয় এবং শরীর অবশ হয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক-ভাবে মৃত্যু ঘটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কতটুকু তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাত কোন অঙ্গের কি ক্ষতি সাধন করে থাকে গবেষণার ফলে সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা পাওয়া গেছে, যেমন:

(১) ০.২৫ গ্রে (২৫ র‍্যাড) এর কম বিকিরণপাতে ব্যক্তিবিশেষের তেমন কোনো ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। তবে কিছু কিছু ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে সাময়িক প্রভাব দেখা দিতেও পারে। ০.৫ গ্রে (৫০ র‍্যাড) এর অধিক বিকিরণপাতে রক্ততন্ত্র প্রভাবিত হয়ে থাকে। ২ গ্রে-এর অধিক বিকিরণ-পাতে রক্ত-উৎপাদী অস্থিমজ্জা ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ ও অবসন্নতা দেখা দেয়। দু'সপ্তাহের মধ্যে চুল পড়া শুরু হয়। এক থেকে

দু'মাসের মধ্যে জীবনাশঙ্কাও ঘটে থাকে ক্ষেত্রবিশেষে। ৪ থেকে ৬ গ্রে বিকিরণপাতে অস্থিমজ্জা লোপ পায় আর ৭ গ্রে-এর অধিক বিকিরণপাতে অস্থিমজ্জা পুনর্জন্মের আর কোনো সম্ভাবনাই থাকে না। ফলে মৃত্যু অবধারিত হয়ে পড়ে। কারণ রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়।

(২) ১০ গ্রে-এর অধিক বিকিরণপাতে পাকস্থলী ও অন্ত্রের গোলযোগ দেখা দেয়। বমি, ডায়রিয়া, অবসন্নতা ইত্যাদিও দেখা দেয়।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রভাবান্বিত অপরাপর দেহাংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দেহত্বক, জননকোষ ও চক্ষু। অবস্থানের দিক থেকে দেহত্বক প্রথমেই বিকিরণপাতের আওতায় আসে এবং অধিকতর বিকিরণপাত ঘটে। বিশেষত স্বল্পশক্তির গামা-রশ্মি ও এক্স-রে এবং বিটা, আলফা ইত্যাকার কণিকা-রশ্মি সহজেই দেহত্বকে বিশোষিত হয়ে থাকে। বিকিরণপাত মাত্রার উপর নির্ভর করে ত্বক লালচে হওয়া, বিবর্ণ হওয়া, ত্বকে ফোস্কা পড়া, চুল পড়া, কোষ মরে যাওয়া, ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। চিকিৎসাশাস্ত্রে এক্স-রে ব্যবহারের শুরুতে অজ্ঞতাবশত রেডিওলজিস্টগণ এক্স-রে ফিল্মে ছবি নেওয়ার সময় হাত দিয়ে ফিল্মটি ধরে রাখতেন বলে তাঁদের হাতে ও মুখে এক্স-রে বিকিরণপাত ঘটতো। তদ্দরুন অনেকের হাতে এবং মুখে চর্মরোগ বিস্তার লাভ করেছিল। ০.৩ গ্রে (৩০ র‍্যাড) বিকিরণপাতেই জননকোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সাময়িক বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। চক্ষুও অত্যন্ত সংবেদী। অল্প কিছু বিকিরণপাতেই চোখ লাল হয়ে যায়, চোখে ছানি পড়ে এবং মারাত্মক পীড়ার সৃষ্টি হয়।

আণবিক বোমা বিস্ফোরণে শুধু যে সাময়িক তাপ ও তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত হয় তাই নয়, অসংখ্য নিউট্রনও বের হয় যা পারিপার্শ্বিক বস্তুর সাথে মিথস্ক্রিয়ায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপন্ন করে। আবহাওয়ামণ্ডল ও জীবজগতে তেজস্ক্রিয় বিদূষণ ঘটে। এসব তেজস্ক্রিয় উপাদান খাদ্য, পানীয় ও শ্বাসের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করে ও আত্তীকৃত হয়। ফলে দেহ দীর্ঘমেয়াদী অভ্যন্তরীণ বিকিরণপাত পায়।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বিলম্বিত প্রভাব

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, অল্প অল্প তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাত দীর্ঘদিন ধরে যাদের উপর ঘটে তাদের মধ্যে কারো কারো ক্ষেত্রে বিলম্বিত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত যে সকল লোক তীব্র বিকিরণপাতের প্রারম্ভিক বা আসন্ন প্রভাব কাটিয়ে উঠেছে তাদের মধ্যেও বিলম্বিত প্রভাব ঘটতে পারে। বিলম্বিত প্রভাব দু'ধরনের যথা: (ক) শারীরিক (somatic) ও (খ) প্রজনন সংক্রান্ত (genetic)।

বিকিরণপাতের দরুন কোষের পরিব্যক্তি (mutation), নিষ্ক্রিয়তা বা মৃত্যু ঘটতে পারে। রোগতাত্ত্বিক (pathology) দিক বিবেচনায় নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াসমূহের সব কয়টি বা কোনো একটি ঘটতে পারে, যথা :

(১) স্থানীয়ভাবে দেহকোষের মৃত্যু (necrosis),
(২) রক্তপাত (haemorrhage),
(৩) রোগ সংক্রমণ (infection), এবং
(৪) টিউমার বা নবকলার (neoplasia) জন্ম।

শরীরিক ক্ষতিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ক্যান্সার সৃষ্টি, বয়ঃসীমা হ্রাস পাওয়া, চোখের ছানি সৃষ্টি, চুলপড়া, বার্ধক্য ত্বরান্বিত হওয়া, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, শারীরিক গঠন ও মানসিক উন্নতি ব্যাহত হওয়া ইত্যাদি। নিম্নে এসব নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(১) ক্যান্সার সৃষ্টি ঃ বিকিরণপাত দেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে তা আজ বহুল প্রমাণিত সত্য। ইতোমধ্যেই উল্লেখিত হয়েছে যে বিকিরণ-কর্মী যাঁরা পরপ্রভ ঘড়ির (luminescent clock) ডায়ালে তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম রঙ লাগাতেন এবং সূক্ষ্মতার খাতিরে রঙের তুলিকে ঠোঁট ও জিহ্বার আগা দিয়ে সময় সময় সুঁচালো করতেন তাঁদের প্রায় সকলেরই হাড়ের ও চোয়ালের ক্যান্সার হয়েছিল। ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম খনি শ্রমিকদের অধিকাংশের মধ্যেই মাত্রাতিরিক্ত হারে ফুসফুসের ক্যান্সার দেখা গেছে, কারণ তারা শ্বাসের সাথে খনির বায়ুতে ছড়িয়ে পড়া তেজস্ক্রিয় পদার্থ গ্রহণ করত। বিকিরণ নিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে যারা এক্স-রে মেশিনে কাজ করেছে তাদের অনেকেরই ত্বকের ক্যান্সার হতে দেখা গেছে। গবেষণাগারে মানবেতর প্রাণীর উপর বিকিরণপাত ঘটিয়ে তাদের দেহে ক্যান্সার সৃষ্টি হতে দেখা গেছে।

বিকিরণপাতের ফলে কিভাবে দেহে ক্যান্সার সৃষ্টি হয় তা আজো সঠিকভাবে জানা যায়নি। কেউ বলেন বিকিরণপাত জীবকোষে বিবর্তন ঘটায়, কেউ মনে করেন বিকিরণপাতে দেহের ক্যান্সার প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়, আবার কারো কারো মতে বিকিরণপাতে শরীরের রাসায়নিক উপাদানের পরিবর্তনই ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী।

(২) বয়ঃসীমা হ্রাস পাওয়া ঃ গবেষণাগারে প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গের উপর বিকিরণপাত ঘটানোর পর এদের বার্ধক্য ত্বরান্বিত হতে দেখা গেছে। যেহেতু

বিকিরণপাতের ফলে জীবকোষে বিবর্তন ঘটে এবং ক্যান্সারসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, তাই অকালমৃত্যুর সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

(৩) চোখে ছানি পড়া ঃ তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাত চোখের জন্য বেশ ক্ষতিকর; চোখের লেন্সের স্বচ্ছতা হ্রাস পায়, রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং চোখে ছানি পড়ে। নিউট্রন ও বিটা বিকিরণপাত এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

(৪) চুল পড়া ঃ বিকিরণপাতের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই চুল পড়ে যায়।

(৫) প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া ঃ জননেন্দ্রিয় বিকিরণপাতের প্রতি অত্যন্ত সংবেদী। পুংকোষ বা ডিম্বকোষে তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতে সাময়িক বা স্থায়ী বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হতে দেখা গেছে।

(৬) বার্ধক্য ত্বরান্বিত হওয়া ঃ পরীক্ষাগারে দেখা গেছে বিকিরণপাতের ফলে জীবদেহের সকল অঙ্গেরই ক্ষয় দ্রুততর হয় এবং অকালবার্ধক্য নেমে আসে। দেখা গেছে বিকিরণপাতগ্রস্ত দেহাংশের চুল তাড়াতাড়ি পেকে যায়।

(৭) দৈহিক গঠন ও মানসিক উন্নতি ব্যাহত হওয়া ঃ মাতৃগর্ভে অথবা শৈশবকালে যারা বার বার এক্স-রে বা অন্য কোনো তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাত পায় তাদের দৈহিক বৃদ্ধি এবং মানসিক উন্নতি ব্যাহত হতে দেখা গেছে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বিস্ফোরণের সময় গর্ভস্থ ভ্রূণ ও শিশুদের মধ্যে এ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রজনন বা বংশগত পরিব্যক্তি (mutation)

বিকিরণপাতে আহত প্রজনন কোষে পরিব্যক্তি ঘটে। ফলে সন্তানসন্ততির মধ্যে বিকিরণপাতের প্রভাব পড়ে; বিকলাঙ্গ ও মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত শিশু জন্মগ্রহণ করে। এ পরিব্যক্তির প্রভাব বংশপরম্পরায় চলতে পারে। কাজেই সমাজে বিকলাঙ্গ ও মানসিক বিকৃতিগ্রস্ত মানুষ তথা পরনির্ভরশীল ও বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলে।

প্রজননক্ষম বয়সে জননকোষে বিকিরণপাত এড়ানোর জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। তজ্জন্য এক্স-রে গ্রহণকালে শিল্ডিং দিয়ে জননকোষ আড়াল করে রাখা উচিত।

গর্ভাবস্থায় বিকিরণপাতে গর্ভপাত (abortion), মৃত-সন্তান প্রসব (still birth) এবং বিকলাঙ্গ, হাবাগোবা ও নির্বোধ শিশুর জন্ম ইত্যাদি ঘটতে পারে। কতটুকু

বিকিরণপাতে প্রজননগত পরিব্যক্তি শুরু হয় তার কোনো নির্ধারিত সীমারেখা নেই। তবে ০.৩ গ্রে (৩০ র‍্যাড) বিকিরণপাতে পুংকোষে অস্থায়ী বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। জীবদেহে বিকিরণপাতে উদ্ভূত প্রভাবাদির প্রবাহচিত্র ৩.১ চিত্রে প্রদর্শিত হলো।

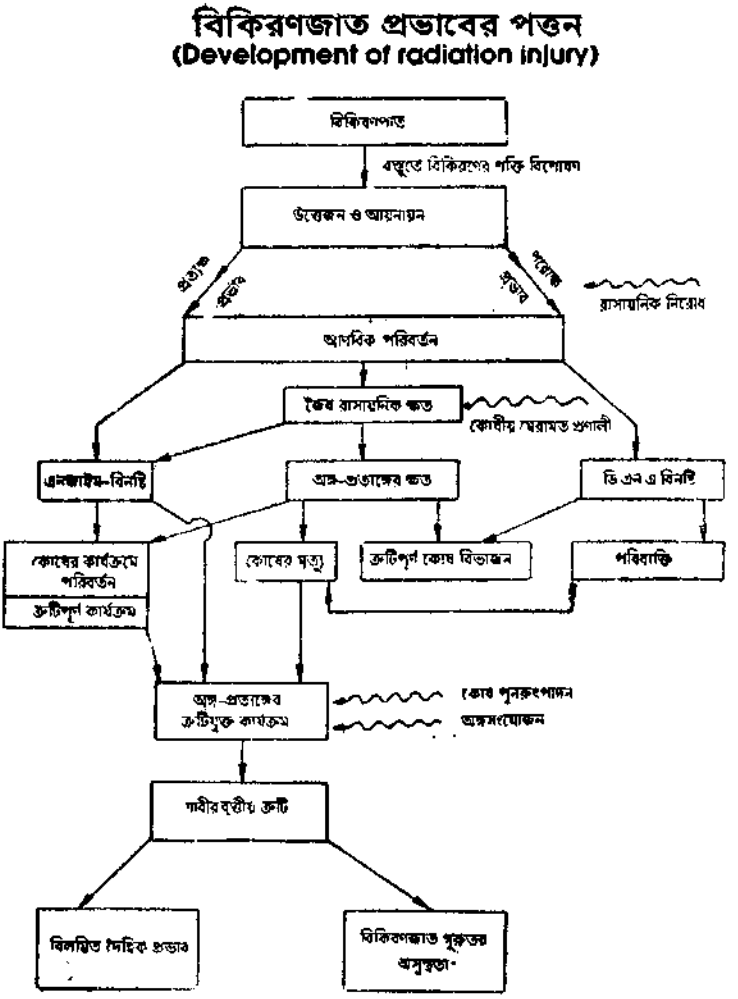

চিত্র ৩.১ : জীবদেহে বিকিরণের প্রভাবের প্রবাহ-নকশা

তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাত ক্ষতিকর হলেও মানবকল্যাণে এর অবদানের সীমা নেই। সারা বিশ্ব জুড়ে আজকাল কৃষি, চিকিৎসা, শিল্প, গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বহুল প্রয়োগ প্রচলিত রয়েছে। তাই বিকিরণ প্রযুক্তি ছাড়া আমাদের জীবনধারণ চলতে পারে না। ফলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিয়ে কাজ না করার কথাই উঠে না। বিকিরণ নিরোধে বিশ্ব জুড়ে নিয়োজিত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশেষ করে International Commission on Radiological Protection (ICRP) তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রা (maximum permissible dose, MPD) বেঁধে দিয়েছে যার আওতাধীনে থেকে কাজ করলে জীবদ্দশায় (৭০ বছর আয়ুষ্কাল ধরে) তেমন

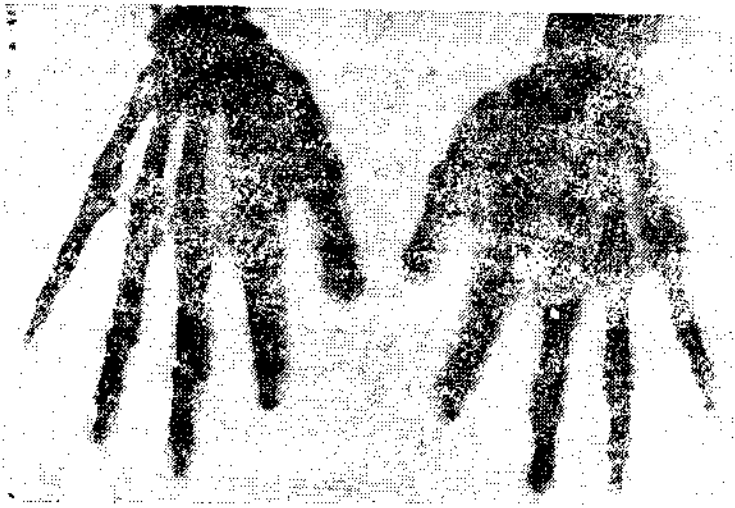

চিত্র ৩.২ : হাতের এক্স-রে চিত্র।

কোনো ক্ষতিরই সম্ভাবনা নেই। সকলেরই উচিত বিকিরণ নিরোধ ও পারমাণবিক নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত বিধানাবলী মেনে বিকিরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিকিরণপাত নিরোধ সংক্রান্ত আইন চালু রয়েছে। বাংলাদেশেও আইনটি চালু করা দরকার।

৩.২ জীবদেহে অতেজস্ক্রিয় বা অনায়নক বিকিরণের প্রভাব

জীবদেহে অতেজস্ক্রিয় বা অনায়নক বিকিরণের মধ্যে আলোকতরঙ্গ, বেতারতরঙ্গ ও মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাতের প্রভাব সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাই এ অংশে জীবদেহে আলোকতরঙ্গ, বেতারতরঙ্গ ও মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাতের প্রভাব আলোচনায় সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হবে।

বিকিরণ ও বস্তুর মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে বিকিরণের শক্তি বস্তুতে স্থানান্তরিত হয় এবং বিকিরণপাতের প্রভাবের পরিমাণ তদ্দরুন দেহে বিশোষিত শক্তির পরিমাণের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অতেজস্ক্রিয় বিকিরণপাত বস্তুর পরমাণুর বহিঃকক্ষস্থ ইলেকট্রনসমূহকে উত্তেজিত করে তোলে। অনায়নক বিকিরণপাত দেহের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়, ফলে জীবদেহের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং দৈহিক (somatic) ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে; সাধারণত তাপ সঞ্চালন ও পরিবাহিতা ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম এমন অঙ্গসমূহ যেমন চক্ষু, জননকোষ, দেহত্বক ইত্যাদি অঙ্গ বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কাল থেকে ইলেকট্রনিক্স শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে লেজার (LASER অর্থাৎ light amplification by stimulated emission of radiation) ও মাইক্রোওয়েভের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। ফলে অতেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের দৈহিক ক্ষতিকর প্রভাবের দিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন পড়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু হয়েছে ও তদ্দরুন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের আইন প্রণয়নের প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমে দৃশ্যমান আলো ও লেজারের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হলো।

দৃশ্যমান আলো ও লেজার

আলোকপাতের ফলে জীবদেহে ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে আদিকাল থেকেই মানুষ সম্যক অবগত রয়েছে। মানুষ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে এ ব্যাপারে বাস্তব জ্ঞান লাভ করেছে, যেমন সূর্যগ্রহণকালে সূর্যের দিকে খালি চোখে তাকালে দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিংবা সম্পূর্ণ লোপ পায়, অতিবেগুনি (ultra-violet, সংক্ষেপে UV) আলো ঝালাইকর্মীদের (welder) চক্ষু নষ্ট করে, কাচ ফাপানো (glass blowing)ও ইস্পাত শিল্প ইত্যাদিতে কর্মরত ব্যক্তিদের চোখে অবলোহিত (infrared) আলোকপাতে সমন দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়, অতিবেগুনি ও অবলোহিত আলোকপাতে চামড়ায় ফোস্কা পড়ে, খসখসে হয়ে যায়, ক্ষত হয় এমনকি তা ক্যান্সারও ঘটায়। শীতপ্রধান দেশে

রৌদ্রস্নানের মাধ্যমে রোদ লাগিয়ে চামড়া তামাটে করা তো সাধারণ অভিজ্ঞতা। অতিবেগুনি বাতির সাহায্যে জীবাণুনাশ এক বহুল প্রচলিত ব্যবস্থা। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এক গবেষণায় পরিলক্ষিত হয় যে পরিশ্রুত (filtered) সূর্যকিরণপাত আধ ঘণ্টায় যক্ষ্মার জীবাণু বিনাশ করে থাকে। 250-270 nanometer (10^{-9} meter) তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো জীবাণুবিনাশে সর্বাধিক কার্যকর; উক্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের 14 MeV শক্তি বিশোষণে জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

জীবদেহ আপতিত আলোকের শক্তি বিশোষণ করে। ফলে দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং আলোক-রাসায়নিক (photochemical) বিক্রিয়া ঘটে আর তদ্দরুন দৈহিক ক্ষতি ঘটে থাকে। কোষকলা (tissue) ও বিশোষিত শক্তির পরিমাণের উপর নির্ভর করে এ ক্ষতির পরিমাণ তথা ধরনধারণ (mode)। দৃশ্যমান আলোর বিকিরণপাতে সচরাচর তেমন কোনো ক্ষতি সাধিত হয় না, কারণ তদ্দরুন সৃষ্ট অল্প পরিমাণ তাপ পরিবহণ (conduction) ও পরিচলন (convection) প্রক্রিয়ায় সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দেহের তাপমাত্রা তেমন বাড়ে না। তবে ঘনীভূত আলোকপাত যেমন লেজার রশ্মিপাত কতিপয় অঙ্গ, যথা চোখ ও ত্বকে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। এ সকল অঙ্গের মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলেই এরূপ ক্ষতি ঘটে থাকে। অতেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও লেজার রশ্মিপাত জীবদেহে কোন অঙ্গের কি ক্ষতি সাধন করে, ক্ষতি নিরোধ নির্দেশিকা (guide) ও গৃহীতব্য নিরোধ ব্যবস্থাদি নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

চোখের ক্ষতি ঃ লেজারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং শক্তি বিশোষণের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে চোখের কর্নিয়া, লেন্স বা রেটিনার ক্ষতির পরিমাণ ও ধরনধারণ। তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণালীর দৃশ্যমান আলোর প্রায় সবটুকুই কর্নিয়া ও লেন্সের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে চলে যায় (transmitted), কিন্তু রেটিনায় বিশোষিত হয়। অতিবেগুনি ও অবলোহিত আলোকের কাছাকাছি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গগুলি কর্নিয়া ও লেন্সের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে পারে না। এ ধরনের বিশোষণ ও সঞ্চালন (transmission) বৈশিষ্ট্য থেকে সহজেই বলা যায় যে দৃশ্যমান তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গমালা (অর্থাৎ আলো) কর্নিয়া ও লেন্সের তেমন ক্ষতি করে না, যেমনটি করে থাকে রেটিনার। দৃশ্যমান আলোকের লেজার বিকিরণপাতের দরুন চোখের প্রধান ক্ষতি হচ্ছে কোরিওরেটিনা (chorioretina) পুড়ে যাওয়া। তাই লেজার রশ্মিপাতের নিরাপত্তা-মান (safety standard) ধরা হয়েছে অপথালমোস্কোপ দ্বারা সনাক্ত করা যায় এমন ক্ষত (lesion) উৎপাদনক্ষম লেজার-রশ্মিপাতের পরিমাণকে, যার মান প্রায় 6 watt/cm^2। চক্ষু

হাড়ের বেষ্টনীতে কোটরাবদ্ধ অঙ্গ বিধায় তাপ বৃদ্ধির দরুন সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ সীমিত এবং তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হতে বেশ সময় লাগে। ফলে দেহের অপরাপর অঙ্গ অপেক্ষা চোখ অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চোখ লালচে হয়ে ফুলে উঠে।

চামড়ার উপর প্রভাব ঃ তীব্র লেজার-রশ্মিপাতের অধিক শক্তি বিশোষণের দরুন চামড়া এমনভাবে পুড়ে যায় যেমনটি ঘটতে দেখা যায় তাপীয় অথবা সৌরতাপে পুড়ে যাবার বেলায়। অতিমাত্রায় লেজার-রশ্মিপাতপ্রাপ্ত স্থানের চামড়া পিণ্ডাকারে মরে যেতেও দেখা যায়। আপতিত লেজার-রশ্মির বিশোষিত শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়ে দেহকোষ মেরে ফেলে। স্থানীয়ভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কোষকলার (tissue) প্রোটিনে অস্বাভাবিকতা বর্তায়। অতিমাত্রায় শক্তি বিশোষণের ফলে দেহকোষস্থ পানি বাষ্প হয়ে উবে যেতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট কোষকলা পুড়ে অঙ্গারে পরিণত হতে পারে। চামড়ায় রঞ্জকের পরিমাণ যত বেশি থাকে লেজার-রশ্মিপাতের সংবেদ্যতাও তত বেশি হয়ে থাকে।

সৃষ্ট ক্ষত সেরে গেলেও অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে দাগ থেকে যায়। তীব্র লেজার-রশ্মিপাত বা দীর্ঘমেয়াদী নিম্নমাত্রার লেজার রশ্মিপাতেও ক্যান্সার সৃষ্টি হতে দেখা যায়নি। অতিবেগুনি আলোকপাত অবশ্য চামড়ায় সংহারী (malignant) ম্যালানোমাসহ (melanoma) অন্যান্য ক্যান্সার সৃষ্টি করতে দেখা গেছে।

নিরোধ নির্দেশিকা ও আদর্শ মান (Protection guides and standards)

দৃষ্টিশক্তির নিরাপত্তার্থে American Conference of Government Industrial Hygienists (A.C.G.I.H) রেটিনার ক্ষতির প্রারম্ভ (threshold) বিকিরণপাত ও লেন্সের আলো ফোকাসকরণ ক্রিয়ার (focussing action) উপর ভিত্তি করে অনুমোদিতব্য সর্বোচ্চ বিকিরণপাত (maximum permissible exposure, সংক্ষেপে M.P.E) সীমা ধার্য করেছে (৩.১ ও ৩.২ সারণিতে তা দেখানো হলো)।

সারণি ৩.১ ঃ **M.P.E. for direct ocular exposure**

তরঙ্গদৈর্ঘ্য ($\lambda, \mu m$)	রশ্মিপাত-কাল (t) Exposure time (sec)	M.P.E
0.400—0.700	10^{-9}—1.8×10^{-5}	5×10^{-7} J/cm^2
0.400—0.700	1.8×10^{-5}—10	$1.8t^{3/4}\times10^{-3}$ J/cm^2
0.400—0.550	10 - 10^4	10×10^{-3} J/cm^2

সারণি ৩.২ : MPE for skin exposure to a LASER beam

তরঙ্গদৈর্ঘ্য (λ, μm)	রশ্মিপাত-কাল (t) Exposure time (sec)	M.P.E
0.315—0.400	10^{-9}—10	$0.56\,t^{1/4}$ J/cm^2
0.315—0.400	10—1000	1 J/cm^2
1.4—1000	10^{-7}—10	$0.56\,t^{1/4}$ J/cm^2

দৃষ্টিশক্তির নিরাপত্তা বিবেচনায় চোখের লেন্সের আলো ফোকাসকরণ (focussing) ও চোখের তারার খোলা উন্মুক্ত ক্ষেত্রফল বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ রেটিনায় লেজার-রশ্মির শক্তি পৌঁছানোর পরিমাণ এদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। রেটিনায় যেটুকু শক্তি পৌঁছে তা রঞ্জিত উপঝিল্লিতে (pigmented epithelium) বিশোষিত হয়ে অধিকাংশই তাপে পরিণত হয়। লেন্সের রশ্মি কেন্দ্রীভূত করার প্রক্রিয়ার দরুন রেটিনায় গঠিত ছবি অক্ষিতারার উন্মুক্ত অংশের (pupilary opening) চেয়ে বহুগুণে ছোট হয়ে থাকে অর্থাৎ শক্তি অল্প জায়গায় ঘনীভূত হয়। যেহেতু রেটিনায় গঠিত ছবির আকার চোখের তারার ব্যাসের ব্যস্তানুপাতিক হয়ে থাকে, তাই চোখের তারার ব্যাসার্ধ বাড়ার সাথে সাথে রেটিনায় আপতিত আলোর ঘনত্বও (concentration) বেড়ে যায়। এই কারণে রক্ষণশীলতা বজায় রাখার জন্য উপরের ৩.১ সারণিতে এ দৃশ্যমান আলোর জন্য M.P.E হিসাবে অক্ষিতারার ব্যাস (pupil diameter) ধরা হয়েছে ৭ মি.মি যা চোখের আইরিস ডায়াফ্রাম (iris diaphragm)-এর সর্বাধিক পরিস্ফুটন (opening)। অপরাপর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণপাতে রেটিনা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বিধায় আপতিত লেজারের শক্তি ১ মি.মি ব্যাসের বৃত্তের মধ্যে গড় করা হয়।

৩.১ ও ৩.২ সারণিতে বর্ণিত নির্দেশিকা শুধুমাত্র উদাহরণরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে A.C.G.I.H এর সর্বশেষ সংস্করণে প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ সারণি দেখে নেওয়া উচিত।

লেজারের নিরাপদ ব্যবহারকল্পে প্রযোজ্য বিধানাবলী

যুক্তরাষ্ট্রে যে দুটি সংস্থা লেজারের নিরাপদ ব্যবহারকল্পে প্রযোজ্য বিধানাবলী প্রজ্ঞাপন (promulgate) করে সেগুলি হচ্ছে : (১) Bureau of Radiological Health (BRH) এবং (২) Occupational Safety and Health Administration (OSHA)। প্রথমোক্ত সংস্থাটি লেজার-যন্ত্রপাতি নির্মাতাদের নির্মাণকালে প্রযোজ্য

নিয়মাবলী যেমন ব্যবহারবিধি, পরিচিতি ইত্যাকার লেবেল এঁটে দেওয়া, লিকপ্রুফ (leak proof) হওয়া, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তজ্জন্য ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি বিচারে লেজারসমূহকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন ঝুঁকিধারী লেজারসমূহকে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে আর ক্রমানুয়ে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ঝুঁকিধারী লেজারসমূহকে চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (সারণি ৩.৩)।

সারণি ৩.৩ ঃ বিভিন্ন শ্রেণীর লেজারের ঝুঁকি-ক্ষমতা (Hazardous Capacity)

লেজারের শ্রেণী	ঝুঁকির-ক্ষমতা
I	কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিকিরণ সৃষ্টি করে না।
II	লাগাতার বিকিরণপাতে চোখের ক্ষতি হয়।
III	ক্ষণিকের intrabeam দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি সাধন করতে পারে।
IV	ক্ষণিকের intrabeam চক্ষু নষ্ট করে এবং বিকিরণপাতে চামড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

লেজারের ক্ষতি করার সামর্থ্য অনুযায়ী নির্মাণ তথা লেবেল আঁটার সময়ে অবশ্যপালনীয় বিনির্দেশ (specification) বিধানে উল্লেখ রয়েছে। প্রস্তুত করার সময় নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(১) প্রতিরক্ষা ও নিরোধকল্পে লেজার-উৎসটি আবরণীতে আবদ্ধ থাকবে যাতে লিকেজ (leakage) মোটেই না থাকে। ফলে অহেতুক বিকিরণপাতের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হবে।

(২) নিরাপত্তামূলক ইণ্টারলক (interlock) ব্যবস্থা থাকবে, যাতে আবরণী সরিয়ে ফেললেও কোনো বিকিরণপাত না ঘটে।

(৩) দূর-নিয়ন্ত্রণ (remote control) সংযোগ থাকবে যাতে অতিরিক্ত ইণ্টারলক থাকে এবং দূর থেকে চালনা ও বন্ধ করার সুবিধা হয়।

(৪) অননুমোদিত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য লেজার যন্ত্রাদি তালাবন্ধ রাখার ব্যবস্থাদি থাকবে।

লেবেলের উপরে লেজারের বৈশিষ্ট্যের বিশদ বর্ণনা, চিহ্ন, ঝুঁকির জন্য সাবধানবাণী ও সংকেত, বিকিরণপাত ইত্যাদি দর্শনীয়ভাবে খোদাই করা থাকবে যাতে সহজেই নজরে পড়ে।

উপরিউক্ত দ্বিতীয় সংস্থাটি (OHSA) শিল্পক্ষেত্রে লেজার নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যবহারকারীর যোগ্যতা, দায়িত্বপালন-স্থান (posting), লেবেলে বর্ণিত বিষয়াদির বিশদ বিবরণ, সর্বোচ্চ অনুমোদিত বিকিরণপাত মাত্রা (dose), লেজার নিরাপত্তার্থে গগলসের মান, ইত্যাদি নির্ধারণ করে থাকে। এ সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী বিকিরণ-কর্মিগণ নিম্নোক্ত তীব্রতার (intensity) অধিক আলোক বিকিরণপাতগ্রস্ত (exposed) হতে পারবে না।

(১) সরাসরি দৃষ্টিগোচরের জন্য প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ১ মাইক্রোওয়াট ক্ষমতার আলোকপাত;

(২) আকস্মিক দৃষ্টিপাতের বেলায় প্রতিবর্গসেন্টিমিটারে ১ মিলিওয়াট ক্ষমতার আলোকপাত; এবং

(৩) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রতিফলিত আলোকের ক্ষেত্রে প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ২.৫ ওয়াট তীব্রতার আলোকপাত।

দৃষ্টিশক্তি রক্ষাত্মক চক্ষু-পরিধেয় (eye protective wear)

দৃষ্টিশক্তির যে কোনো রকম ক্ষতি পরিহার করার জন্য চোখে গগলস (goggles) পরিধান করা দরকার। তদ্দরুন লেজার আলোর তীব্রতা হ্রাস পায়, কিন্তু চতুষ্পার্শ্বস্থ আলো এসে নিরাপদ দেখার কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য করে।

নিরাপত্তামূলক পরিমাপন (Safety Measurements)

যে কোনো লেজারের নিরাপত্তামূলক বিষয় নির্ণয় করতে হলে ইহার ক্ষমতা বা শক্তি এবং রশ্মির অপসারিতা (beam divergence) নিরূপণ করার দরকার হয়। তজ্জন্য দুই ধরনের ক্ষমতা ও শক্তি পরিমাপন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর একটি আলোক-তড়িৎ প্রভাব (photo-electric effect) এবং অপরটি তাপীয় প্রভাবের (thermal effect) উপর ভিত্তি করে কাজ করে থাকে।

এবার বেতার-তরঙ্গ ও মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাতের ফলে জীবদেহের উপর সৃষ্ট প্রভাবের উপর আলোচনা করা হলো।

জীবদেহে বেতার-তরঙ্গ ও মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাতের প্রভাব

সচরাচর 0.3—30 MHz কম্পাঙ্কবিশিষ্ট (তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১০০০ মিটার থেকে নিম্নে ১০ মিটার) তড়িৎ-চুম্বকীয় (electromagnetic) বিকিরণকে ঢালাওভাবে বেতার-তরঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে আর 30 MHz—300 GHz কম্পাঙ্কবিশিষ্ট (১০ মিঃ — 0.০০১ মিঃ তরঙ্গদৈর্ঘ্য) তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণকে মাইক্রোওয়েভ রূপে

আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং দেখা যায় এদের আওতায় রয়েছে সমুদয় স্বল্প-দৈর্ঘ্য তরঙ্গ ও মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ যা যোগাযোগ ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করে চলেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কাল থেকে।

রেডারের (RADAR, যা Radio detection and ranging এর সংক্ষিপ্ত রূপ) জন্য নির্ধারিত কম্পাঙ্ক ব্যাণ্ড (frequency band) ৩.৪ সারণিতে দেখানো হলো আর শিল্প, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ব্যাণ্ড ৩.৫ সারণিতে দেখানো হলো। মাইক্রোওয়েভ কম্পাঙ্ক ব্যাণ্ডের তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই হ্রস্ব (কয়েক মিলিমিটার মাত্র) আর বেতার কম্পাঙ্কের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশ বড় (কয়েকশত মিটার পর্যন্ত)। হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তিকে বাতাস অথবা শূন্যস্থানের ভিতর দিয়ে আলোকরশ্মির মতো তীব্র (intensed) রশ্মিতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রেরণ করা যায় বিধায় মাইক্রোওয়েভ কম্পাঙ্ক ব্যাণ্ডের বিকিরণ যোগাযোগ ও রেডারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তদুপরি এদের মাধ্যমে অনেক বেশি তথ্য প্রেরণ সম্ভব হয়।

সারণি ৩.৪ ঃ মাইক্রোওয়েভ কম্পাঙ্ক ব্যাণ্ড

ব্যাণ্ড	কম্পাঙ্ক	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
L	1,000—1,400	0.270—0.214
S	2,600—3,950	0.115—0.076
C	3,950—5,850	0.076—0.0513
X	8,200—12,400	0.0366—0.0242
K	18,000—26,000	0.0167—0.0116

সারণি ৩.৫ ঃ শিল্প, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত কম্পাঙ্ক ব্যাণ্ড

কম্পাঙ্ক	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
13.56	66.37
27.12	33.19
40.68	22.12
915	0.33
2,450	0.122
5,000	0.052
22,125	0.014

Dha...

রেডারে হ্রস্ব তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতীব প্রখর বিদ্যুৎ-স্পন্দ (pulse) বিশিষ্ট মাইক্রো-ওয়েভ অ্যান্টেনা (antenna) থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় যা দূরবর্তী কোনো চলমান পদার্থে প্রতিফলিত হয়ে আবার প্রত্যাবর্তন করে থাকে। বস্তুটির দূরত্ব ও অবস্থান প্রত্যাবর্তিত সংকেত থেকে নিরূপণ করা যায় সহজেই। লাগাতার এরূপ অবস্থান ও দূরত্ব নিরূপণের সাহায্যে চলমান কোনো বস্তুর গতিপথ, গতি ও দিক নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

উষ্ণায়ন প্রতিক্রিয়া (Heating effect)

বস্তু ও মাইক্রোওয়েভের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ায় মাইক্রোওয়েভের শক্তির কতকাংশ প্রতিফলিত হতে পারে, কতকাংশ সামান্য শক্তি স্থানান্তরিত করে অতিক্রম করে যেতে পারে আর কতকাংশ বস্তুতে বিশোষিত হয়ে এর তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। দুইটি কারণে এ তাপ উৎপাদিত হয়ে থাকে। প্রথম ও প্রধান কারণটি মনে করা হয় বিশোষণ মাধ্যমে মাইক্রোয়েভ বিকিরণ কর্তৃক আবিষ্ট বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা উৎপাদিত আয়নিক বিদ্যুৎ-প্রবাহ (ionic current) এবং প্রবাহের দরুন সৃষ্ট তাপ। আর দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে বিশোষণ মাধ্যমে বিদ্যমান চৌম্বক পোলারায়িত অণুসমূহ ও উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া। কারণ পোলারায়িত অণুসমূহ বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রে যথাযথ একরেখাকরণ (alignment) রক্ষণার্থে পরিবর্তী বিদ্যুতের (alternating current) প্রভাবে সামনে-পিছনে আন্দোলিত হয়ে থাকে। কিন্তু বিদ্যমান অপরাপর আন্তরাণবিক (intermolecular) শক্তিসমূহ এ ধরনের আন্দোলনে বাধা সৃষ্টি করে যা পর্যুদস্ত করতে গিয়ে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-ক্ষেত্র যে কাজ করে তা তাপে রূপান্তরিত হয়।

27 MHz কম্পাঙ্কবিশিষ্ট ব্যাণ্ডটি শিল্প-কারখানা ও গৃহস্থালির কাজে dielectric heating এর জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন কাঠ শুকাতে বা জোড়া দিতে, প্লাস্টিক গলিয়ে জোড়া লাগাতে, সুতিদ্রব্য তাপ-প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদিতে। অপরদিকে 915 ও 2450 MHz ব্যাণ্ডগুলি শিল্প-কারখানা তথা গৃহস্থালি কাজে মাইক্রোওয়েভ উত্তাপনের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় অতিদ্রুত উত্তাপন কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আজকাল রান্নার কাজে মাইক্রোওয়েভের ব্যাপক ব্যবহার চালু হয়েছে, কারণ এর দ্বারা রান্না দ্রুত সম্পন্ন করা যায়। প্রচলিত চুল্লিতে রান্নার সময় পাত্রের গাত্র ও চতুষ্পার্শ্বস্থ বাতাস গরম হওয়ার পর খাদ্যবস্তুর গাত্রে তাপ স্থানান্তরিত হয়ে বস্তুগর্ভে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। পদ্ধতিটি মোটের উপর বেশ অদক্ষ ও ধীরগতিসম্পন্ন। অপর-দিকে মাইক্রোওয়েভ উষ্ণায়নে চুল্লি এবং চুল্লির অভ্যন্তরীণ পরিবেশ উত্তপ্ত হয় না,

মাইক্রোওয়েভের সমুদয় শক্তিই খাদ্যবস্তুতে বিশোষিত হয়। তদুপরি মাইক্রোওয়েভ বস্তুগাত্রের ১—২ সে.মি. অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে বিধায় বস্তুগর্ভ সরাসরি তাপের আওতায় পড়ে। ফলে শক্তির দক্ষ ব্যবহার ঘটে এবং দ্রুত রান্না হয়। মাইক্রোওয়েভের বস্তুগর্ভে প্রবেশ ক্ষমতা তথা বস্তুগর্ভ উত্তপ্ত করার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে গাত্রচর্ম তেমন উত্তপ্ত না করেই দেহাভ্যন্তরস্থ আহত অথবা রোগাক্রান্ত গ্রন্থিসন্ধি (joints) ও কোষকলায় তাপ প্রয়োগ করা যায়। এ প্রক্রিয়াকে Medical Microwave Diathermy বলা হয়ে থাকে।

মাইক্রোওয়েভের জৈব-দৈহিক প্রভাব (Biological effects)

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কোষকলা জৈবিক জলীয় দ্রবণে ডুবানো গাঠনিক ছাঁচে (structural matrix) তৈরি। উক্ত গাঠনিক ছাঁচ (matrix) আবার দৃঢ়সংবদ্ধ অণু দ্বারা তৈরি। এ সব অণু আবার প্রায়ই বৈদ্যুতিকভাবে পোলারায়িত হয়ে থাকে। আবার জৈবিক জলীয় দ্রবণে রয়েছে দ্রবীভূত তড়িৎ-বিশ্লেষ্য (electrolyte) ও বৃহদাকার অণুর (macromolecule) আয়নসমূহ। এরা উচ্চ কম্পাঙ্কের তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ থেকে উদ্ভূত বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবাধীনে আসে। এ সকল আবিষ্ট শক্তির দরুন তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং তদ্দরুন সংশ্লিষ্ট জৈবিক উপাদানে তাপের সৃষ্টি হয়। অনড় (immobile) গাঠনিক অণুর উপর ক্রিয়াশীল দ্রুত পরিবর্তী বৈদ্যুতিক শক্তি এদের আন্দোলিত বা আবর্তিত করে থাকে। ফলে তাপের উৎপাদন ঘটে থাকে। তদুপরি বিভিন্ন দিকে মুখ করে থাকা চৌম্বক পোলারায়িত অণুসমূহও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে একমুখী লাইনবদ্ধ (oriented) হতে পারে। জীবন্ত বস্তুর মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাতে এ দু'ধরনের আবিষ্ট শক্তির প্রভাব একত্রে ঘটে থাকে।

প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ১০ মিলিওয়াট (mw) বা তদূর্ধ্ব মাইক্রোওয়েভ রশ্মিপাতে তাপীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। জীব জন্তু নিয়ে পরীক্ষায় দেখা গেছে দেহের তাপমাত্রা 5°C বেড়ে গেলে তা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। পরিলক্ষিত হয়েছে যে 3,000 MHz কম্পাঙ্কের ৩০০ মিলিওয়াট/(সে.মি.)^2 ১৫ মিনিট ব্যাপী মাইক্রো-ওয়েভ বিকিরণপাতে ইঁদুরের দৈহিক তাপমাত্রা 8—10°C বেড়ে গিয়ে ইঁদুরটির মৃত্যু ঘটেছে এবং প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ১০০ মিলিওয়াট বিকিরণপাতে দেহের তাপমাত্রা 6—7°C বেড়ে গেছে এবং ২৫ মিনিটে মৃত্যু ঘটেছে।

জীবদেহে সঞ্চিত তাপ নিম্নোক্ত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$S = M \pm R \pm C - E \qquad (৩.৮)$$

যেখানে S = তাপ সঞ্চয়ের হার,
M = বিপাকক্রিয়ার ফলে উৎপাদিত তাপ,
R = বিকিরণজনিত তাপক্ষয় বা তাপগ্রহণ,
C = পরিবহণ ও পরিচলনজনিত তাপক্ষয় বা তাপগ্রহণ,
E = বাষ্পীভবনজনিত শীতলায়নের কারণে তাপক্ষয়।

বিশ্রাম গ্রহণকালে ব্যক্তিবিশেষ বিপাকক্রিয়ার ফলে ৭৫ ওয়াট হারে তাপ উৎপাদন করে আর সাধারণ কাজ বা ব্যায়ামে নিয়োজিত থাকাকালে তাপ উৎপাদন বেড়ে ৩০০ ওয়াটে উঠে যেতে পারে। তাপমাত্রা বা আর্দ্রতা স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে না গেলে উৎপাদিত এ তাপ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে, অন্যথায় ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তবে তাপমাত্রা ।°C এর অধিক বেড়ে গেলে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ শুরু হয়।

তাপ-আর্দ্রতার সূচক (temperature humidity index, যা সংক্ষেপে দাঁড়ায় THI) আরামের শ্রেণী ব্যবধান (comfort range) নির্দেশ করে থাকে। THI-কে গাণিতিক সূত্র দ্বারা লিখলে দাঁড়ায়,

$$THI = 0.72\,(T_d + T_w) + 40.6 \qquad (৩.৯)$$

যেখানে, T_d = শুষ্ক-বাল্ব তাপমাত্রা (°C) এবং
T_w = আর্দ্র-বাল্ব তাপমাত্রা (°C)।

আপেক্ষিক আর্দ্রতার (Relative humidity, RH) শতকরা হিসাবে সমীকরণ ৩.৯কে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়

$$THI = 1.44T_d + 0.1R_H + 30.6 \qquad (৩.১০)$$

সাধারণত ৬৫ থেকে ৮০ এর মধ্যবর্তী THI মানকে আরামপ্রদ ধরা হয়।

ব্যক্তিবিশেষের দেহের অভিক্ষিপ্ত (projected) আয়তন ০.৯ বর্গমিটার ধরে দেখা যায় প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ১০ মিলিওয়াট ক্ষমতা ঘনত্ব (power density) বিশিষ্ট আপতিত বিকিরণপাতের সমুদয় শক্তি বিশোষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দেহে নিম্নোক্ত হারে শক্তি স্থানান্তর ঘটে

$$0.9\,m^2 \times \frac{10\,mW}{cm^2} \times \frac{10^4\,(cm)^2}{m^2} \times 10^{-3}\,\frac{W}{mW} = 90\,W$$

সুতরাং দেখা যায় স্বাভাবিক কর্মচাঞ্চল্যেই দেহে 90 W তাপ উৎপন্ন হয় এবং THI এর মান ৭০ ছাড়িয়ে না গেলে কোনো অসুবিধা না ঘটিয়েই পরিবেশে তাপ

বিমুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু THI এর মান ৮০ ছাড়িয়ে গেলেই অসুবিধা সৃষ্টি হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে সারাদেহে 10 mW/cm^2 ঘনত্বের বিকিরণপাতে দৈহিক তাপীয় চাপ THI এর মানের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাতজাত অধিকাংশ প্রামাণ্য (documented) দৈহিক ক্ষতির কারণ হিসেবে অতিমাত্রায় উষ্ণায়নকে (hyperthermia) দায়ী করা হয়ে থাকে। অতিমাত্রার উষ্ণায়নে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় চক্ষু ও অণ্ডকোষ, কারণ এ দুটো অঙ্গ হাড়ে ঘেরা কোটরে আবদ্ধ বিধায় পরিচলন বা পরিবহণ প্রক্রিয়ায় $10-15\ mW/cm^2$ এর অধিক বিশোষিত তাপ প্রশমন করতে পারে না। চোখের লেন্স যেহেতু এক-রসনালীর (avascular) ও ক্যাপসুলাবদ্ধ কোষকলা, তাই বর্ধিত তাপে অরক্ষিত ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাতে তাপাহত হলে চোখের নানাবিধ রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। উষ্ণায়ন (thermal) ও অনুষ্ণায়ন (nonthermal) উভয়ে মিলেই এ উপসর্গগুলি সৃষ্টি করে এবং পরিশেষে চোখে ছানি উৎপাদন করে। মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাতের দরুন সৃষ্ট ক্ষত চক্ষুর লেন্সের ক্যাপসুলের পেছনের গাত্রে শুরু হয়। বার্ধক্যজনিত চক্ষুছানি কিন্তু লেন্সের গাত্রের সম্মুখভাগে শুরু হয়। মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাতে সৃষ্ট বর্ধিত তাপই চক্ষুছানির সূত্রপাত ঘটায়। এর ফলে চক্ষুর তাপমাত্রা 45°C বা তদূর্ধ্বে বর্ধিত করার মতো মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাত ছানির সূত্রপাত করে বলে বিশেষজ্ঞগণ ধারণা করে থাকেন। প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ১০০ মিলিওয়াট বা তদূর্ধ্ব বিকিরণপাতে ছানি পড়ার ঝুঁকি মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায়।

অণ্ডকোষের ক্রিয়া তাপমাত্রার দ্বারা অতিরিক্ত প্রভাবিত হয়ে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় দেহকোটরের বাইরে অবস্থানকালে অণ্ডকোষের তাপমাত্রা কোটরের তাপমাত্রার (37°C) চেয়ে 2°C কম থাকে। অণ্ডকোষের তাপমাত্রা 37°C এ উঠলেই শুক্র উৎপাদন অবদমিত হয়ে পড়ে।

মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাতের অনুষ্ণায়ন প্রভাবসমূহের জৈব-দৈহিক কার্যপদ্ধতি অদ্যাবধি সুস্পষ্টরূপে জানা না গেলেও গবেষণায় বহু অনুষ্ণীয় বিকিরণজনিত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। দীর্ঘদিন প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ১০ মিলিওয়াটের কম মাত্রায় বিকিরণপাত প্রাপ্ত পেশাজীবীদের মধ্যে পরিলক্ষিত ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ ৩.৬ ও ৩.৭ সারণিতে সংক্ষেপে বিবৃত হলো।

সারণি ৩.৬ ঃ দীর্ঘমেয়াদী বিকিরণপাতপ্রাপ্ত পেশাজীবীদের মধ্যে পরিলক্ষিত রোগলক্ষণপুঞ্জ

লক্ষণ (Symptoms)

অতিমাত্রায় অবসন্নতা
পর্যায়িক (periodic) বা সতত মাথা ধরা
অত্যধিক ক্রোধপ্রবণতা (irritability)
কাজের সময় নিদ্রালুতা
ঘ্রাণশক্তি হ্রাস

নিদর্শনাদি (Signs)

নিম্ন হৃদস্পন্দন হার
অস্বাভাবিক নিম্ন রক্তচাপ
গলগণ্ডের অতিসক্রিয়তা (hyper thyroidism)
রক্তের হিস্টামিন মান বৃদ্ধি

সারণি ৩.৭ ঃ মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ-ক্ষেত্রে কর্মীদের মধ্যে ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ
(Subjective effects on workers in microwave fields)

মাথাব্যথা, চক্ষু পীড়া, অবসন্নতা, ঝিমুনি, ঘুমের ব্যাঘাত, বিরক্তি, বিষণ্ণতা, অসামাজিকতা, ভীতি, স্নায়ুবিক চাপ, মানসিক চাপ, স্মৃতিভ্রষ্টতা, পেশীতে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, ঘাম বৃদ্ধি, যৌন অক্ষমতা, ইত্যাদি।

গবেষণাগারে জীব জানোয়ারের উপর উচ্চহারে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাতে মস্তিষ্ক-তরঙ্গ, রক্তগঠন, কোষঝিল্লির প্রবেশ্যতা, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও আচরণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে।

মাইক্রোওয়েভ নিরোধ নির্দেশিকা ও মান (Protection guides and standards)

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও জীবদেহের মধ্যে সংঘটিত মিথস্ক্রিয়ার ধরন-ধারণ ইতোমধ্যেই সুস্পষ্টভাবে জানা হয়েছে এবং এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিকিরণ-পাত মাত্রা পরিমাপনের এককাদি ও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু অতেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের বেলায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাত ও জীবদেহের মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়ার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আজো সম্যক উপলব্ধি করা সম্ভব হয় নি। মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাতের ফলে জীবদেহে শক্তি বিশোষণের

প্রক্রিয়া বেশ জটিল কারণ কখনও দেখা যায় ইহা কম্পাঙ্ক ও বিশোষকের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার (dielectric properties) উপর নির্ভরশীল এবং শক্তি বিশোষণের ধারাও অঙ্গ ও অঙ্গসংস্থানের উপর নির্ভরশীল। পেশীর জলীয় অংশের পরিমাণও বিশোষণ বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে তাত্ত্বিক বা পরীক্ষণ উপায় দ্বারা এদের পরিমাপন বড়ই কঠিন হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় চর্ম, মাংসপেশী ও সমুদয় অভ্যন্তরীণ অঙ্গে প্রভূত পরিমাণ তরল পদার্থ বিদ্যমান বিধায় মাইক্রো-ওয়েভপাতে অতিমাত্রায় শক্তি বিশোষিত হয়; অপরদিকে চর্বি, অস্থি ও অস্থিমজ্জায় তরলের ভাগ তুলনামূলকভাবে কম বিধায় বিশোষণও কম ঘটে। অধিকন্তু নানা ধরনের মাংসপেশী চর্বি, চামড়া, ইত্যাদির উপরিগাত্রে বিভিন্ন মাত্রার প্রতিফলন পরিস্থিতিকে আরো জটিল করেছে। শারীরিক আকার এবং অবস্থানিক জ্যামিতিও শক্তি বিশোষণ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এ সমুদয় জটিলতা, অনিশ্চয়তা এবং মাইক্রোওয়েভ-এর বৈশিষ্ট্যাদি সম্বন্ধে সীমিত জ্ঞানের দরুন মাইক্রোওয়েভ নিরোধে ব্যবহৃত মানকে (standard) বিকিরণপাত (exposure) একক যেমন ক্ষমতা-ঘনত্ব (power density, $\frac{mW}{cm^2}$) বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র-শক্তি/মিটার বা চুম্বকীয় ক্ষেত্র-শক্তি/মিটার (ampere/m) হিসেবে প্রকাশ করার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। প্রথমোক্ত মানটি দূরবর্তী ক্ষেত্রের (far-field) অবস্থায় আর শেষোক্ত মানদ্বয় নিটকবর্তী ক্ষেত্র (near field) অবস্থায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

পেশাজীবী ও জনসাধারণকে মাইক্রোওয়েভ বিকিরণপাতের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিরাপত্তা দানকল্পে বিশ্বের নানা দেশে নিয়ন্ত্রণবিধি ঘোষিত হয়েছে এবং কার্যকর রয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য প্রশাসন (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) আপতিত (incident) মাইক্রোওয়েভপাতের বেলায় পেশাজীবীদের জন্য সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রা প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ১০ মিলিওয়াট নির্ধারণ করেছে। মাইক্রোওয়েভ চুল্লি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৫ সেন্টিমিটার দূরে প্রতি বর্গসেন্টিমিটারে ১ মিলিওয়াট বিকিরণপাত অনুমোদিত হয়েছে; চুল্লির জীবদ্দশায় ৫ সেন্টিমিটার দূরে প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটারে ৫ মিলিওয়াট লিকেজজনিত বিকিরণপাত অনুমোদন পেয়েছে।

কোনো পেশাজীবী একই সময়ে একাধিক বিভিন্ন কম্পাঙ্কের বিকিরণপাতগ্রস্ত হলে নিরাপত্তার জন্য নিম্নোক্ত সূত্র মেনে কাজ চালাতে হবে।

$$\frac{W_1}{L_1} + \frac{W_2}{L_2} + \frac{W_3}{L_3} + \text{- - - -} \frac{W_n}{L_n} \leq 1$$

[যেখানে $W_1, W_2, W_3, \ldots W_n$ হচ্ছে যথাক্রমে 1, 2, 3 - - - n কম্পাঙ্কে প্রতিষঙ্গী শক্তি-ঘনত্ব এবং L_1, L_2, L_3 - - - - L_n যথাক্রমে 1, 2, 3 - - - n. কম্পাঙ্কের প্রতিষঙ্গী সীমা নির্দেশক শক্তি-ঘনত্ব।]

সারণি ৩.৮ ঃ সারাদেহে রেডিও-ফ্রিকুয়েন্সি আরক্ষা নির্দেশিকা (wholebody radio-frequency protection guide)

কম্পাঙ্ক রেঞ্জ (MHz)	শক্তি-ঘনত্ব (mW/cm^2)	E^2 (V/m^2)	H^2 (A/m^2)
0.3—3	100	400,000	2.5
3—30	$900/f^2$	4,000	0.025
30—300	1.0	4,000	0.025
300—1500	f / 300	4,000	0.025
1,500—300,000	5.0	20,000	0.125

উপরের সারণিতে সারাদেহে মাইক্রোওয়েভপাতের জন্য নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রদত্ত হলো।

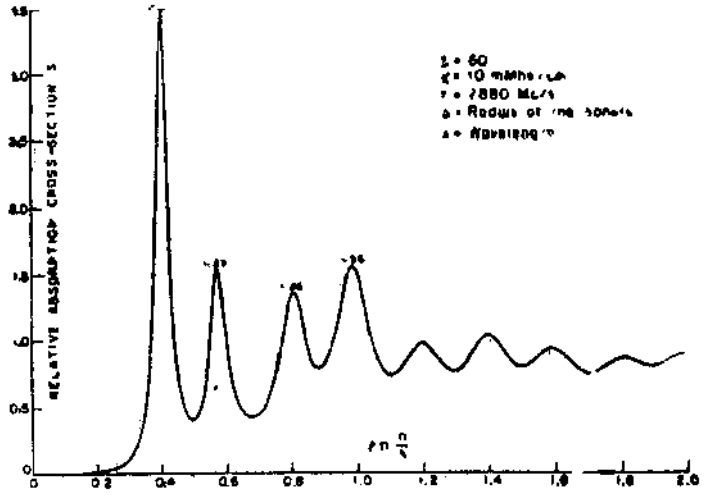

চিত্র ৩.৩ ঃ শক্তির নির্ভরশীলতা নির্দেশকারী রেখা।

চতুর্থ অধ্যায়

তেজস্ক্রিয়তা, বিকিরণসম্পাত ও ডোজ পরিমাপনের এককসমূহ

(Units of measurements of radioactivity, radiation exposure and doses)

৪.১ পরিচিতি

বিকিরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জীবদেহে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ক্ষেত্রবিশেষে জীবনের ঝুঁকিসহ মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবও বিস্তার করে থাকে। ইতোমধ্যেই পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগনির্ণয় ও রোগ নিরাময়ে, কৃষি ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধী উচ্চ ফলনশীল বীজ উদ্ভাবনে, শস্য সংরক্ষণ তথা নিরুপদ্রবকরণে ও পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণে, শিল্প ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণে ও বিকিরণ প্রক্রিয়াজাতকরণে এবং গবেষণা ও উন্নয়নে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বহুল প্রয়োগ প্রচলিত রয়েছে। এছাড়া আমাদের চলতে পারে না। তাই বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব এড়িয়ে কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করার জন্য একে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা দরকার আর তার জন্য জানা আবশ্যক কতটুকু বিকিরণ দেহে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করে। তজ্জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিকিরণের পরিমাণ পরিমাপন। আর এই পরিমাপনের জন্য চাই উপযোগী পরিমাপন একক। বিকিরন নিরোধ নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্যও বিকিরণকে পরিমাণগতভাবে জানতে হবে। তাই বিকিরণ পরিমাপন ও নিরোধকল্পে ব্যবহৃত এককসমূহ ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদ (terms) নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

কোনো জিনিসের পরিমাণগত ধারণা লাভের জন্য সাধারণত সংশ্লিষ্ট জিনিসটির একটি সুনির্দিষ্ট ও সুবিধাজনক অংশ বা পরিমাণকে প্রমিত মান (standard) রূপে ধরে উহার পরিমাপ করা হয়। পরিমাপের এ প্রমিত মানকে পরিমাপন একক বলা হয় আর সংশ্লিষ্ট জিনিসে এই এককটুকু যতবার থাকে সেই সংখ্যা উহার পরিমাণ নির্দেশ করে। যেমন সুনির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের একখানি দণ্ডকে ১ মিটার ধরে কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য বা স্থানের দূরত্ব তদ্‌নুযায়ী পরিমাপ করা হয়।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রথম প্রয়োগ ঘটে চিকিৎসাশাস্ত্রে। তখনও এর সঠিক পরিমাণ পরিমাপের সুবিধাদি গড়ে ওঠেনি তেমন। তাই বিকিরণপাত নিরূপণার্থে ক্লীপবদ্ধ এক টুকরো ডেন্টাল ফটোগ্রাফিক ফিল্মকে (photographic film) বিকিরণ

মাত্রা পরিমাপক (Dosemeter) রূপে ব্যবহার করা হতো। এ ফিল্মে ছায়াপাত সৃষ্টি করার মতো বিকিরণকে প্রমিত মান ধরে দৈনিক ব্যবহারের সর্বোচ্চ অনুমোদিত ডোজ (maximum permissible dose) হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। আর রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত উচ্চ সম্পাত মাত্রার (high exposure) ক্ষেত্রে চামড়ায় লালিমা (erythema) সৃষ্টি হয় এমন পরিমাণ ডোজকে প্রমিত মান ধরা হতো। আমরা আজ জানি দেহে বিশোষিত বিকিরণ ডোজ (radiation absorbed dose) সংশ্লিষ্ট বিকিরণের শক্তির উপর নির্ভরশীল ; এতদ্ব্যতীত আরো বহুবিধ ত্রুটিযুক্ত বিধায় উল্লেখিত পদ্ধতিগুলি বিকিরণপাত মাত্রা নিরূপণ কিংবা বিকিরণ নিরোধ উভয়বিধ কোনো উদ্দেশ্যই সঠিকভাবে পূরণ করতে পারে নি। ফলে অতিরিক্ত বিকিরণপাত ঘটে এবং চুলপড়া, চর্মরোগ ও নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির উদ্ভব ঘটে। হাসপাতালে কর্মরত বিকিরণ-কর্মিগণ বিকিরণপাত এড়ানোর জন্য সচেতন হয়ে উঠেন। ১৯২৫ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক রেডিওলজিকেল সম্মেলনে বিকিরণ পরিমাণকরণের (quantification) প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। ফলে ১৯২৮ সালে রন্টগেন এককে (এ ব্যাপারে পরবর্তীতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে) প্রমিত একক রূপে গ্রহণ করা হয়। সে যাই হোক, অধুনা তেজস্ক্রিতা ও তেজস্ক্রিয়পাত (radiation exposure) পরিমাপনের জন্য দুই ধরনের একক চালু রয়েছে—(১) পুরাতন একক (earlier units) ও (২) আন্তর্জাতিক পদ্ধতি একক (International System units, সংক্ষেপে S.I. unit)। আন্তর্জাতিক পদ্ধতির একক ক্রমে ক্রমে পুরাতন এককের স্থান দখল করে নিচ্ছে। সংজ্ঞাসহ সেগুলির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।

৪.১ তেজস্ক্রিয়তার একক (Units of radioactivity)

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে তেজস্ক্রিয়তার একক হলো বেকারেল (Becquerel, সংক্ষেপে Bq)। তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারক ফরাসি পদার্থবিদ হেনরী বেকারেলের (১৮৯৬ খ্রিঃ) সম্মানার্থে তাঁর নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে। General Conference of Weights and Measures (GCWM) ১৯৭৫ সালে এ সিদ্ধান্ত নেয়। কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থের যতটুকু বস্তুতে প্রতি সেকেন্ডে একটি করে পরমাণুর ভাঙ্গন ঘটে ততটুকুর সক্রিয়তাকে ১ বেকারেল বলা হয়। নিম্নোক্ত উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বিশদ ব্যাখ্যা করা যায়।

ইউরেনিয়াম-২৩৮ (অর্ধায়ু 8.৫×১০^{১০} বছর) ও তদীয় জাতক থোরিয়াম-২৩৪ (অর্ধায়ু ০.০৬৩ বছর) এর প্রত্যেকের এক গ্রাম বস্তুতে প্রায় সমসংখ্যক

($\sim$২.৫ × ১০^{২১} টি) পরমাণু বিদ্যমান কিন্তু এদের ভাঙনের হার ভিন্ন ভিন্ন। থোরিয়াম-২৩৪ এর পরমাণু ভাঙনের হার ইউরেনিয়াম-২৩৮ এর চেয়ে ৬.৮×১০^{১০} গুণ বেশি। অর্থাৎ ১ গ্রাম থোরিয়াম-২৩৪ থেকে নিঃসৃত তেজস্ক্রিয়তা ৬.৮×১০^{১০} গ্রাম ইউরেনিয়াম-২৩৮ থেকে নিঃসৃত তেজস্ক্রিয়তার সমান। তদ্রূপ সালফার-৩৫ (অর্ধায়ু ৮৭ দিন) ও ফসফরাস-৩২ (অর্ধায়ু ১৪.৩ দিন) এর প্রতি গ্রাম বস্তুতে প্রায় সমসংখ্যক পরমাণু বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তেজস্ক্রিয় ফসফরাস-৩২ এর ভাঙনের হার তেজস্ক্রিয় সালফার-৩৫ এর চেয়ে ৬ গুণ বেশি। তাই স্পষ্টতই দেখা যায় যে এক গ্রাম ফসফরাস-৩২ থেকে নিঃসৃত তেজস্ক্রিয়তা প্রায় ৬ গ্রাম সালফার-৩৫ থেকে নিঃসৃত তেজস্ক্রিয়তার সমান। কাজেই তেজস্ক্রিয়তার ক্ষেত্রে বস্তুর পরিমাণ তেমন কোনো গুরুত্ব বহন করে না অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় বস্তু প্রয়োগের বেলায় নিঃসৃত তেজস্ক্রিয়তাই বিচার্য বিষয়, বস্তুর পরিমাণ নয়। তাই তেজস্ক্রিয়তার একক তেজস্ক্রিয়তার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আরো লক্ষণীয় যে যদিও বেকারেলকে তেজস্ক্রিয় ভাঙনের হার রূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, বাস্তবে ইহা তেজস্ক্রিয় ভাঙনের হার নয়—ইহা আসলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ। কেননা প্রতি সেকেন্ডে একটি পরমাণু রূপান্তরণকালে এক বা একাধিক কণা অথবা রশ্মি নিঃসৃত হতে পারে, যথা শুধু বিটা-কণিকা নির্গমকারী পদার্থের বেলায় একটিমাত্র পরমাণুর ভাঙন ঘটে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে একাধিক কণিকা বা রশ্মি নির্গত হয়। এক্ষেত্রে স্পষ্টত দেখা যায় যে প্রতি বেকারেল তেজস্ক্রিয়তার জন্য প্রতি সেকেন্ডে তিনটি বিকিরণ বেরিয়ে আসে। তদ্রূপ পটাশিয়াম-৪০ এর বেলায় শতকরা ১১ ভাগ ক্ষেত্রে বিটা-কণার সাথে একটি গামা-রশ্মিরও (1.46 MeV) নির্গমন ঘটে।

এক বেকারেল অতি সামান্য পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তা নির্দেশ করে বিধায় ইহার নিম্নোক্ত গুণিতকের বহুল প্রয়োগ প্রচলিত রয়েছে:

১ কিলো বেকারেল (1KBq) = 10^{3}Bq
১ মেগা বেকারেল (1MBq) = 10^{6}Bq
১ গাইগা বেকারেল (1GBq) = 10^{9}Bq
১ টেরা বেকারেল (1TBq) = 10^{12}Bq, ইত্যাদি।

এক বেকারেলের অংশবিশেষকে নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যায়:

১ মিলি বেকারেল (1mBq) = 10^{-3}Bq
১ মাইক্রো বেকারেল (1μBq) = 10^{-6}Bq

১ ন্যানো বেকারেল (1nBq) = 10^{-9}Bq
১ পিকো বেকারেল (1pBq) = 10^{-12}Bq, ইত্যাদি।

তেজস্ক্রিয়তার পূর্বতন (earlier) একক হচ্ছে কুরি (Curie, সংক্ষেপে Ci)। তেজস্ক্রিয় রেডিয়ামের আবিষ্কারক নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী মাদাম কুরি ও পিয়েরে কুরির নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে। আবিষ্কারের সাথে সাথেই চিকিৎসা-শাস্ত্র, শিল্প ক্ষেত্র এবং গবেষণা ও উন্নয়নে তেজস্ক্রিয় রেডিয়ামের বহুল প্রয়োগ প্রচলিত হয়। এ কথা জানা যে এক গ্রাম রেডিয়াম-২২৬ থেকে একক সময়ে ৩.৭×১০^{১০} সংখ্যক পরমাণু ভেঙ্গে যায়। তাই যতটুকু তেজস্ক্রিয় বস্তু থেকে প্রতি সেকেন্ডে ৩.৭×১০^{১০} সংখ্যক পরমাণু ভেঙ্গে যায় সে পরিমাণ বস্তুকে ১ কুরি বলা হয়। ১ কুরি (1Ci) = ৩.৭×১০^{১০} সংখ্যক পরমাণুর রূপান্তরণ/সেকেন্ডে।

যেহেতু এক কুরি বেশ বড় অঙ্কের তেজস্ক্রিয়তা নির্দেশ করে তাই ইহার অংশবিশেষ ব্যবহারের বহুল প্রচলন রয়েছে। উহার উপগুণিতকগুলি নিম্নরূপ:

১ মিলিকুরি (1 mCi) = ৩.৭×১০^{৭} টি পরমাণু ভাঙ্গন/সে.
= 10^{-3}Ci
১ মাইক্রোকুরি (1 μCi) = ৩.৭×১০^{৪} টি পরমাণু ভাঙ্গন/সে.
= 10^{-6}Ci
১ ন্যানোকুরি (1 nCi) = ৩৭টি পরমাণু ভাঙ্গন/সে.
= 10^{-9}Ci
১ পিকোকুরি (1 pCi) = ০.৩৭ টি পরমাণু/সে.
= 10^{-12}Ci
১ ফেমটোকুরি (1 fCi) = ০.৩৭×১০$^{-৩}$ পরমাণু ভাঙ্গন/সে.
= 10^{-15}Ci, ইত্যাদি

এক কুরির নিম্নোক্ত গুণিতকগুলিরও বেশ প্রচলন রয়েছে:

১ কিলোকুরি (1KCi) = 10^{3}Ci
১ মেগাকুরি (1MCi) = 10^{6}Ci
১ গাইগাকুরি (1GCi) = 10^{9}Ci ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিকিরণ নিরোধ, পারমাণবিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য-পদার্থবিদ্যা ও তেজস্ক্রিয়তা প্রয়োগের অন্যান্য বাস্তব ক্ষেত্রে উপরিউক্ত আহৃত (derived) এককসমূহের বহুল প্রয়োগ প্রচলিত রয়েছে। এরূপে

1 Bq = 2.703×10^{-11} Ci

BAEDOC Library
Accession No. 18889

৪.৩ বিকিরণপাত ও বিশোষিত ডোজের একক (Units of radiation exposures and absorbed doses)

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উপস্থিতির দরুন কোনো বস্তুমাধ্যমের কোনো বিন্দুতে যে পরিমাণ বিকিরণ শক্তি বিরাজ করে তাকে বিকিরণপাত ডোজ (exposure dose) বলা হয় আর বস্তুটিতে যে পরিমাণ বিকিরণ শক্তি শোষিত হয় তাকে শোষিত ডোজ (absorbed dose) বলে।

এ ক্ষেত্রেও দুধরনের পরিমাণগত একক চালু রয়েছে—(১) পূর্বতন পদ্ধতির একক (earlier units) ও (২) আন্তর্জাতিক পদ্ধতির একক (International System unit সংক্ষেপে S.I. unit)। সংক্ষেপে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

বিকিরণপাত মাত্রার পূর্বতন একক হচ্ছে রন্টগেন। রঞ্জনরশ্মির আবিষ্কারক জার্মান পদার্থবিদ উইলহেলম কনর‍্যাড রন্টগেন (১৮৯৫ খ্রিঃ)-এর নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে। ১৯২৮ সালে 'আন্তর্জাতিক রঞ্জনরশ্মি ও রেডিয়াম বিকিরণ নিরোধ কমিটি' (International Committee on X-ray and Radium Radiation Protection) রঞ্জনরশ্মি ও গামা-রশ্মি পরিমাপনার্থে 'রন্টগেন' একক গ্রহণ করে। রন্টগেন (Roentgen) একক দ্বারা বাতাসে বিকিরণের আয়নায়ন ঘটানোর ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এখন দেখা যাক রন্টগেন একক কি।

৪.৩.১ রন্টগেন একক (Roentgen Unit)

এক একক রন্টগেন হচ্ছে সেই পরিমাণ রঞ্জন-রশ্মি অথবা গামা-রশ্মি যা স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে বিদ্যমান প্রতি ঘনসেন্টিমিটার (ওজন ০.০০১২৯৩ গ্রাম) শুষ্ক বাতাসে আয়নায়ন ঘটিয়ে এক একক স্থিরবিদ্যুৎ (one electrostatic unit of statical electricity, সংক্ষেপে 1 e.s.u) বহনক্ষম ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক আধান সৃষ্টি করতে পারে। এ কথা জানা যে এক একক আধান বহনকারী আয়নে ৪.৮×১০^{-১০} একক স্থিরতড়িৎ থাকে। সে হিসাবে দেখা যায় ১ রন্টগেন বিকিরণ বাতাসে $\frac{১}{৪.৮ \times ১০^{-১০}} = ২.১ \times ১০^{৯}$টি আয়ন-জোড়া (ion pair) সৃষ্টি করে। বাতাসে একটি আয়ন-জোড়া সৃষ্টি করতে প্রায় ৩৪ ইলেকট্রন ভোল্ট (eletron volt, সংক্ষেপে eV) শক্তি ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। আর ১ ইলেকট্রন ভোল্ট $= ১.৬ \times ১০^{-১২}$ আর্গ। তদনুযায়ী দেখা যায় ১ রন্টগেন বিকিরণপাতের জন্য বাতাসে বিশোষিত শক্তির পরিমাণ হচ্ছে

$$\frac{২.১ \times ১০^{৯} \times ৩৪ \times ১.৬ \times ১০^{-১২}}{০.০০১২৯৩} = ৮৮ \text{ আর্গ/গ্রাম।}$$

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে ঘনত্ব ও পারমাণবিক সংখ্যার ভিন্নতার দরুন বিভিন্ন বস্তুতে ১ রন্টগেন বিকিরণ বিশোষণের ফলে বিশোষিত শক্তির (absorbed energy) পরিমাণে বেশ হেরফের ঘটে। আবার রঞ্জনরশ্মির শক্তির বিভিন্নতার জন্যও একই বস্তুতে বিশোষিত শক্তির পরিমাণে হেরফের হয়। যেমন কোমল কোষকলার (soft tissue) বেলায় ১ রন্টগেন বিকিরণ বিশোষণের দরুন ৯৮ আর্গ/গ্রাম শক্তি বিশোষণ ঘটে আর পানির বেলায় প্রায় ৯৩ আর্গ/গ্রাম শক্তি বিশোষিত হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে বিকিরণপাত পরিমাপ করা হয় এক্সপোজার এককে (Exposure Unit)। এক কিলোগ্রাম শুষ্ক বাতাসে ১ কুলম্ব (Coulomb) আধান উৎপাদনে সক্ষম এমন পরিমাণ রঞ্জনরশ্মি বা গামা-রশ্মিকে ১ এক্সপোজার একক বলা হয়ে থাকে।

১ X একক = ১ কুলম্ব / কেজি বাতাসে।

অতএব দেখা যায় এক্সপোজার একক বাতাসে সৃষ্ট আয়নায়নের পরিমাণ নির্দেশ করে। রঞ্জনরশ্মি বা গামা-রশ্মি ক্ষেত্রের শক্তি বুঝাতে এ একক ব্যবহার করা হয়। লক্ষণীয় যে খুব অল্প শক্তি যেমন KeV পর্যায়ের নিচে বা বেশি শক্তির (যেমন 3 MeV এর বেশি) রশ্মির ক্ষেত্রে বাতাসে সৃষ্ট আয়নায়নের সীমাবদ্ধতার জন্য এক্সপোজার একক কার্যকর হতে পারে না। তাই 3 MeV এর অধিক শক্তির রশ্মির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত একক হচ্ছে ওয়াট-সেকেন্ড/বর্গমিটার। হিসাবে দেখা যায়

১ X একক = ৩৪ গ্রে (বাতাসে) আর ১ রঞ্জন = $\frac{\text{১ X একক}}{\text{৩৮৮১}}$।

স্মর্তব্য যে এক্সপোজার একক বিকিরণপাতের সমাকলিত (integrated) মাপ এবং সময়ের উপর নির্ভরশীল নয়। এবার বিশোষিত ডোজ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

৪.৩.২ বিশোষিত ডোজের (absorbed dose) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত এককসমূহ

দেহে বিকিরণপাতের প্রভাব বিশোষিত শক্তির উপর সর্বাংশে নির্ভরশীল ও আনুপাতিক। তাই একক ভরে বিশোষিত বিকিরণ শক্তিকে বিশোষিত ডোজ হিসেবে গণ্য করা হয়। দেহে বিশোষিত ডোজ 'D' হলে, গাণিতিক ভাষায় ইহা দাঁড়ায়,

$$D = \frac{de}{dm} \qquad (৪.১)$$

এখানে 'de' হচ্ছে 'dm' ভরে বিশোষিত গড় শক্তির পরিমাণ। আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে বিশোষিত শক্তির একক 'গ্রে' (Gray, সংক্ষেপে Gy)। প্রতি কিলোগ্রাম

ভরে এক জুল শক্তি বিশোষিত হলে তাকে ১ গ্রে ধরা হয়। গণিতের ভাষায়

$$১ \text{ গ্রে} = \frac{১ \text{ জুল}}{১ \text{ কেজি ভর}} \qquad (8.২)$$

রঞ্জনরশ্মি, গামা-রশ্মি, আহিত কণা অথবা নিউট্রন যাই হোক না কেন সব ধরনের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বেলায়ই এ একক ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞানী 'গ্রে' প্রথম বিশোষিত ডোজের ধারণা দেন। তাই তাঁর নামানুসারে এ এককের নামকরণ করা হয়েছে।

বিশোষিত ডোজের পূর্বতন একক 'রেড' (RAD, যা Radiation Absorbed Dose এর সংক্ষিপ্ত রূপ) প্রতি গ্রাম ভরে ১০০ আর্গ শক্তি বিশোষিত হলে তাকে এক 'রেড' ধরা হয়। গণিতের ভাষায়

$$১ \text{ রেড} = \frac{১০০ \text{ আর্গ}}{১ \text{ গ্রাম ভর}} \qquad (8.৩)$$

যেহেতু ১ জুল = ১০ আর্গ আর ১ কেজি = ১০০০ গ্রাম, তদনুসারে ১ গ্রে = ১০০ রেড। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে আন্তর্জাতিক পদ্ধতির একক 'গ্রে' ধীরে ধীরে রেডকে প্রতিস্থাপন করছে। তবে এখনও রেড-এর বহুল প্রচলন চালু রয়েছে।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিকিরণ শক্তি বিশোষণ বিকিরণের ধরন (যেমন আলফা, বিটা, নিউট্রন বা গামা রশ্মি), ইহার শক্তি এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গের গভীরতা ও উহার উপাদানগত গঠনপ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ঘনতর উপাদান ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের সমন্বয়ে গঠিত হাড় অপেক্ষাকৃত হাল্কা হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন ইত্যাদি উপাদানে গঠিত কোমল কোষ-কলার (soft tissue) চেয়ে বহুগুণে বেশি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বিশোষণ করে থাকে।

8.8 আপেক্ষিক তেজস্ক্রিয়তা (Spacific activity)

লক্ষণীয় যে বেকারেল অথবা কুরি তেজস্ক্রিয়তার একক হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভর বা আয়তন সম্পর্কে কোনো ধারণা সেগুলি থেকে মেলে না। তাই প্রতি একক ভরে বিদ্যমান তেজস্ক্রিয়তাকে আপেক্ষিক তেজস্ক্রিয়তা বলা হয়। ইহাকে বেকারেল/কেজি বা কুরি/গ্রাম রূপেও প্রকাশ করা হয়।

BANGLADOS Library

৪.৫ লেট (LET)

LET হচ্ছে Linear Energy Transfer এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর অর্থ হচ্ছে রৈখিক শক্তি স্থানান্তরণ। কোনো তেজস্ক্রিয় বিকিরণ গতিপথের একক দূরত্ব অতিক্রম-কালে বস্তুমাধ্যমে যে পরিমাণ শক্তি স্থানান্তরিত করে তাকেই LET বলা হয়। ইহাকে সাধারণত $KeV/10^{-4}cm$ এ প্রকাশ করা হয়। LET এর মান থেকে বুঝা যায় শক্তি স্থানান্তরের ধরন কি এবং কি পরিমাণ দৈহিক ক্ষতি ঘটতে পারে।

৪.৬ বিকিরণপাত-মাত্রাসমতুল (Dose equivalent) বা তুল্য মাত্রা

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে LET এর মান ভারি তড়িৎ-আধানবাহী কণিকা যেমন আলফা, প্রোটন ইত্যাদির বেলায় রঞ্জনরশ্মি বা গামা-রশ্মির চেয়ে অনেক বেশি এবং জৈবিক (biological) ক্ষতি সাধনের ক্ষমতাও তদনুযায়ী অনেক বেশি। দেখা গেছে সমপরিমাণ হাল্কা বিকিরণ ও গামা বিকিরণ ডোজের জৈবিক ক্ষতির পরিমাণ সমান তো নয়ই বরঞ্চ আলফা-বিকিরণ ডোজে সমান গামা-বিকিরণ ডোজের ২০ গুণ বেশি জৈবিক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। অন্যকথায় সমপরিমাণ জৈবিক প্রভাব উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের বিকিরণের বিভিন্ন মাত্রা প্রয়োগ করতে হয়। তাই বিকিরণ নিরোধকল্পে, ইঞ্জিনিয়ারিং design criteria-এর জন্য এবং আইনগত ও প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদনার্থে বিভিন্ন ধরনের বিকিরণ থেকে প্রাপ্ত ডোজসমূহকে তুল্য ওজন উৎপাদক (weighting factor) দিয়ে গুণ করে একই স্কেলে পরিমাপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। তাই বিকিরণ মাত্রাকে গুণগত উৎপাদক (Quality factor, সংক্ষেপে Q.F.) বা আপেক্ষিক জৈবদৈহিক কার্য-কারিতা (Relative Biological Effectiveness, সংক্ষেপে R.B.E) ও বিতরণ উৎপাদক (distribution factor, সংক্ষেপে D.F) দ্বারা গুণ করে তুল্য মাত্রা (dose equivalent) বা মাত্রা সমতুল নিরূপণ করা হয়। গাণিতিকভাবে,

$$\text{মাত্রা সমতুল (H) Sv} = \text{D. grays} \times \text{Q.F} \times \text{D.F}$$

আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতিতে D ও H এর একক জুল/কেজি। Q.F. ও D.F. মাত্রাহীন। দেহের বিশোষিত ডোজ পরিমাপনে পথিকৃৎ বিখ্যাত সুইডিশ স্বাস্থ্যপদার্থবিদ সিভার্ট-এর নামানুসারে তুল্য মাত্রার এককের সিভার্ট নামকরণ করা হয়েছে।

১ সিভার্ট = ১ জুল/কিলোগ্রাম। সিভার্টেরও নানা গুণিতক ও উপগুণিতক রয়েছে যেমন রয়েছে ইতিপূর্বে আলোচিত তেজস্ক্রিয়তার এককের। এ প্রসঙ্গে Q.F ও R.B.E. সম্বন্ধে আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে চোখের ছানি সৃষ্টিতে নিউট্রন বিকিরণ রঞ্জনরশ্মি বিকিরণের চেয়ে ২০ গুণ

অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন; তদ্রূপ আলফা বিকিরণও বিটা বা গামা বিকিরণের চেয়ে ২০ গুণ অধিকতর ক্ষতিকারক। এ ধরনের তুলনায়, বিভিন্ন ধরনের বিকিরণের সমপরিমাণ শক্তি বিশোষণের উপর ভিত্তি করেই তুলনা করা হয়েছে। সচরাচর রৈখিক শক্তি স্থানান্তর (LET) যত বেশি, জীবদেহে তত অধিক ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। জীবদেহে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতি উৎপাদনের জন্য 200 KeV শক্তির যতটুকু রঞ্জনরশ্মির দরকার ঠিক ততটুকু পরিমাণ ক্ষতি জীবদেহে উৎপাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিকিরণের প্রয়োজনীয় পরিমাণের অনুপাতকে আপেক্ষিক জৈবদৈহিক কার্যকারিতা (Relative biological effectiveness, সংক্ষেপে RBE) বলা হয়; গাণিতিকভাবে ইহা নিম্নোক্ত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়:

$$R.B.E = \frac{\text{জীবদেহে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতি সাধনের জন্য 200 KeV শক্তিসম্পন্ন রঞ্জনরশ্মির পরিমাণ}}{\text{জীবদেহে সমপরিমাণ ক্ষতি সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিকিরণের প্রয়োজনীয় পরিমাণ}}$$

বিকিরণ জীববিদ্যার ক্ষেত্রেই শুধু R.B.E ব্যবহার সীমাবদ্ধ। স্বাস্থ্য-পদার্থ-বিজ্ঞানে বিভিন্ন ধরনের বিকিরণপাত যোগ করার জন্য এতদ্ব্যতীত অপর একটি normalizing factor ব্যবহার করা হয় যাকে Quality factor (Q.F.) বলা হয়ে থাকে। বিভিন্ন বিকিরণের Q.F. এর মান নিচে ৪.১ সারণিতে দেওয়া হলো।

সারণি ৪.১: বিভিন্ন ধরনের বিকিরণপাতের জন্য Q.F. এর মান

বিকিরণপাতের ধরন	Q.F.
গামা-রশ্মি, রঞ্জনরশ্মি, বিটা-রশ্মি > 0.03 MeV	১
বিটা-রশ্মি < 0.03 MeV	১.৭
তাপীয় নিউট্রন	২
দ্রুতগতি নিউট্রন	১০
প্রোটন	১০
আলফা	২০
ভারি আয়ন	২০

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যাক। ১ মিলি গ্রে (m Gy) রন্টগেন অথবা বিটা বিকিরণপাতের মাত্রাসম ১ মিলিসিভার্ট (1m Sv), কিন্তু

১ মিলিগ্রে আলফা-বিশোষিত বিকিরণপাতের মাত্রাসম ২০ মিলিসিভার্ট (20 mSv)। আরো একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, যথা—

একটি সাইক্লোট্রনের বিকিরণ নিরোধী আবরণের (shielding) বাইরে গামা-রশ্মিপাতজনিত বিকিরণ মাত্রা 5μ Gy / hr বা 0.5 m rad/ha, তাপীয় নিউট্রন-পাত মাত্রা 2 μ Gy/hr 0.2 m rad/hr ও দ্রুতগতি নিউট্রন মাত্রা 1 μ Gy/hr বা 0.1 m rad / hr। সম্মিলিত মাত্রাসম কত?

সমাধান

গামা-রশ্মি	5μ Gy / hr × 1 = 5μ Sv/hr
তাপীয় নিউট্রন	2μ Gy / hr × 2 = 4μ Sv/hr
দ্রুতগতি নিউটন	1μ Gp / hr × 20 = 20μ Sv/hr
সুতরাং মোট মাত্রাসম (H)	= 29μ Sv / hr

৪.৮ রেম (REM)

ইহা মাত্রাসমের পূর্বতন (earlier) একক। ইহার পূর্ণরূপ হচ্ছে Roentgen equivalent mammals (রন্টগেন সমতুল স্তন্যপায়ী)

$$1 \text{ rem} = 10^{-8} \text{ Sv}$$

$$H, \text{rems} = D, \text{rads} \times Q.F \times D.F.$$

উপরের উদাহরণে ডোজ সমতুল rem-এ প্রকাশ করলে দাঁড়ায় ২.৯ মিলিরেম/ঘণ্টা।

৪.৭ কার্যকর ডোজ সমতুল (Effective dose equivalent)

উপরের আলোচনা ও ৪.১ সারণি থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে বিভিন্ন ধরনের বিকিরণের (যেমন, আলফা-রশ্মি, বিটা-রশ্মি, নিউট্রন-রশ্মি, রঞ্জনরশ্মি, গামা-রশ্মি) একই ডোজের বিকিরণপাতে জীবদেহে বিভিন্ন পরিমাণ প্রভাব পড়ে। তাই দেহে বিকিরণপাতের প্রভাব জানার জন্য ডোজ সমতুল জানার দরকার পড়ে। তদ্রূপ দেহের বিভিন্ন অঙ্গও একই মাত্রা সমতুল বিকিরণপাতে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং জীবন মানও সমান ঝুঁকিগ্রস্ত হয় না। যেমন মাথার মগজ, হৃদপিণ্ড, জনন-কোষ (gonad) ইত্যাদি অঙ্গ জীবন ধারণের জন্য ও উপভোগের জন্য যেরূপ অপরিহার্য (vital), হয়তো অন্যান্য অঙ্গ (যেমন একটি চোখ বা হাত) ততটা নয়।

তদুপরি দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকিরণের প্রতি সমান সংবেদীও নয়। যেমন জননকোষ, অস্থিমজ্জা, ইত্যাদি বিকিরণপাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। সারাদেহে বিকিরণপাতের প্রভাবের আপেক্ষিকতায় দেহের কতিপয় কোষকলার (tissue) সংবেদ্যতা ৪.২ সারণিতে দেখানো হলো। সারাদেহে সমভাবে বিকিরণপাত ঘটলে ঝুঁকি গুণাঙ্ককে (risk factor) ১ ধরা হয়ে থাকে। আর অসম (nonuniform) বিকিরণপাতের বেলায় (যেমন দেহের অংশবিশেষ বিকিরণ-গ্রস্ত হলে বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ কোনো অঙ্গে পুঞ্জীভূত হলে) ৪.২ সারণিতে প্রদত্ত ওজন গুণাঙ্ক (weighting factor) বিভিন্ন অঙ্গের আপেক্ষিক সংবেদ্যতা অনুযায়ী ব্যবহার করে কার্যকর ডোজ সমতুল (H_E) হিসাব করা হয়; গাণিতিক সূত্রে ইহা নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়,

$$H_E = \Sigma W_T H_T$$

যেখানে $W_T \rightarrow T$ কোষকলার বেলায় প্রযোজ্য ওজন গুণিতক এবং

$H_T \rightarrow T$ কোষকলায় প্রাপ্ত ডোজ সমতুল।

সারণি ৪.২ : ওজন ও ঝুঁকি গুণাঙ্ক (weighting and risk factor, W_T and H_T)

কোষকলা	ঝুঁকি Sv^{-1}	মন্তব্য	W_T
জননকোষ	8.0×10^{-3}	দুই পুরুষ পর্যন্ত বংশগত ঝুঁকি	০.২৫
স্তন	2.5×10^{-3}	সব বয়সের এবং নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য	০.১৫
লোহিত অস্থিমজ্জা	2.0×10^{-3}	লিউকেমিয়া	০.১২
ফুসফুস	2.0×10^{-3}	ক্যান্সার	০.১২
গলগণ্ড	5.0×10^{-4}	গুরুতর ক্যান্সার	০.০৩
অস্থিগাত্র	5.0×10^{-4}	হাড়ের ক্যান্সার	০.০৩
অন্যান্য	5.0×10^{-3}	ক্যান্সার	০.৩০
মোট ঝুঁকি	1.65×10^{-2}		১.০০

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যা করা যাক।

উদাহরণ

গবেষণাগারে দুর্ঘটনায় 370,000 Bq ^{131}I এক কর্মীর দেহে নিম্নরূপে সঞ্চিত হয়েছে

(১) 74,000 Bq গলগণ্ডে

(২) 296,000 Bq দেহের অবশিষ্ট অংশে।

হিসাবে দেখা গেল গলগণ্ড পেয়েছে 123m Gy এবং দেহ 0.26m Gy। তাহলে কার্যকর ডোজ সমতুল কত?

সমাধান

$$H_E = 0.03 \times 123 + 0.97 \times 0.26 = 3.94\text{m Sv}$$

কমিটেড ডোজ সমতুল (Committed dose equivalent)

জীবদেহ দু'ধরনের বিকিরণপাতের আওতায় আসতে পারে, যথা (১) দেহের বাইরে বিদ্যমান তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দেহে আঘাত হানতে পারে এবং (২) খাদ্য, পানীয় ও শ্বাস মাধ্যমে এবং ক্ষতস্থান দিয়ে দেহে ঢুকতে পারে এবং বিশেষ বিশেষ অঙ্গে সঞ্চিত হতে পারে যেমন আয়োডিন থাইরয়েড গ্রন্থিতে পুঞ্জীভূত হয়, থোরিয়াম হাড়ে সঞ্চিত হয়, ইত্যাদি। দেহাভ্যন্তরে পুঞ্জীভূত তেজস্ক্রিয় পদার্থ অনবরত বিকিরণপাত করে থাকে যে পর্যন্ত না ক্ষয় পেয়ে নিঃশেষিত হয়ে যায় বা বিপাকের মাধ্যমে দেহ থেকে নিঃসৃত হয়ে যায়। কোনো তেজস্ক্রিয় উপাদান দেহে আত্তীকৃত হওয়ার পর যে সমাকলিত (integrated) ডোজ সমতুল প্রদান করে তাকে কমিটেড ডোজ সমতুল (committed dose equivalent) বলা হয়। সমাকলনের সময় ধরা হয় পঞ্চাশ বছর।

$$H_{50} = \int_{t=0}^{t=50y} H(t)\,dt$$

যেখানে $H(t)$ ডোজ সমতুলের হার।

পঞ্চম অধ্যায়

বিকিরণ নিরোধ নির্দেশিকা
(Radiation protection guides)

৫.১ ভূমিকা

এ সত্য আজ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিকিরণ জীবদেহে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের ফলে সামান্য চুল পড়া থেকে শুরু করে প্রাণঘাতী মারাত্মক ক্যান্সারের উদ্ভব পর্যন্ত ঘটতে পারে। বর্তমান সভ্যতা তথা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে বিকিরণের অবদান অপরিমেয়। তাই এর ক্ষতিকর প্রভাব এড়িয়ে বিকিরণকে কাজে লাগানোর উপায় বের করা দরকার। বিকিরণ নিয়ে কাজ করার সময় এর ক্ষতিকর প্রভাব নিরোধকল্পে অনুসরণীয় বিধি-নিষেধ, রীতি-নীতি ও নিয়মকানুন, জীবদেহে বিকিরণের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক ইতোমধ্যেই স্থিরীকৃত ও নির্দেশিত হয়েছে। এসব বিধিনিষেধ পালন ও নিয়মকানুন মেনে বিকিরণ নিয়ে কাজ করলে জীবদ্দশায় তেমন কোনো ঝুঁকিরই আশঙ্কা থাকে না। বিকিরণ প্রয়োগে নিরাপদ পদ্ধতি উদ্ভাবনে নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে কয়েকটি প্রধান সংস্থা হচ্ছে 'আন্তর্জাতিক বিকিরণ নিরোধ সংস্থা' (International Commission on Radiological Protection, সংক্ষেপে ICRP), আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (International Atomic Energy Agency, সংক্ষেপে IAEA), International Commission on Radiological Units and Measurements সংক্ষেপে (ICRU), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organization, সংক্ষেপে ILO), বিকিরণ নিরোধ ও পরিমাপনার্থে জাতীয় পরিষদ (National Council on Radiological Protection and Measurements, সংক্ষেপে NCRP)। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সংস্থাটি (ICRP) বিকিরণ নিরোধকল্পে নির্দেশাবলী (guidances) নির্ধারণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

১৯২৮ সালে আন্তর্জাতিক রঞ্জনরশ্মি ও রেডিয়াম নিরোধ সংস্থা রূপে (International Commission on X-ray and Radium Protection) ICRP-এর প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে ব্যবহৃত বিকিরণ থেকে

নিরাপত্তা (safety) এবং ক্ষতিকর প্রভাব নিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশাদি প্রণয়ন ও ব্যবহার বিধিমালা নিরূপণসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় দেখার দায়িত্ব বর্তায় এ সংস্থার উপরে। পরবর্তীকালে চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিকিরণের ব্যাপক ব্যবহার চালু হওয়ায় উক্ত সংস্থাটির কর্মপরিধি বেড়ে যায় এবং ১৯৬০ সাল থেকে বর্তমান নামেই সংস্থাটি পরিচিত হয়ে আসছে। বর্তমানে ইহা বিকিরণ নিরোধ সংক্রান্ত মূল নীতিমালা নির্ধারণ করে। স্ব স্ব দেশের উপযোগী কারিগরি প্রবিধি (technical regulation) ও ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত যাবতীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন ও কার্যকর করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। সংস্থাটি উহার সুপারিশাদি যথাযথ সাময়িকীতে প্রকাশ করে থাকে।

আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA), ICRP কর্তৃক প্রণীত সুপারিশাদি বিশ্বের নানা দেশে কার্যকর করার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। বিকিরণ নিরোধ ও নিরাপত্তার মান (standard) নিরূপণের দায়িত্ব এ সংস্থার উপর ন্যস্ত রয়েছে। এ সংস্থা থেকে পারমাণবিক বিষয়ে সহায়তা লাভে আগ্রহী প্রতিটি সদস্যদেশ তদ্‌কর্তৃক বিকিরণ নিরোধ ও নিরাপত্তাকল্পে সুপারিশকৃত বিধানাবলী পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সংস্থাটি বিকিরণোদ্ভূত স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরোধ ও পারমাণবিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সময় সময় সুপারিশকৃত বিধানসমূহ বিষয়ানুযায়ী নিরাপত্তা অনুক্রমে (safety series) প্রকাশ করে থাকে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) শ্রমিকদের সামাজিক সাধারণ সমস্যাদি সমাধানে জড়িত বিধায় বিকিরণ পেশায় নিয়োজিত কর্মীদের পেশাজনিত ঝুঁকি ও আপদ নিয়ন্ত্রণের সুপারিশাদি প্রণয়ন করে কতিপয় পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।

ICRU বিকিরণ ও তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নিরূপণের জন্য ব্যবহৃতব্য সুবিধাজনক একক নির্ধারণে নিয়োজিত। এই সংস্থা ICRP-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলেমিশে কাজ করে থাকে। নিম্নোক্ত বিষয়ে সুপারিশমালা প্রণয়ন এর আওতাধীন:

(১) বিকিরণ ও তেজস্ক্রিয়তার এককসমূহ নির্ধারণ;

(২) চিকিৎসাশাস্ত্রে ও বিকিরণ-জীববিদ্যায় প্রযুক্ত তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ পরিমাপন ও প্রয়োগবিধি নির্দেশনা; এবং

(৩) উপরিউক্ত বিধিমালা প্রয়োগার্থে প্রয়োজনীয় ভৌত উপাত্ত নির্ধারণ যাতে প্রতিবেদিত উপাত্তের মধ্যে সাম্য বজায় থাকে।

ICRU-এর মতে মূলনীতি ঠিক রেখে প্রত্যেক দেশের উচিত স্ব স্ব দেশের উপযোগী পরিমাপন পদ্ধতি ও একক প্রচলন করা। তবে দেখতে হবে যেন

মানের (standard) কোনো হেরফের না ঘটে। অন্যথায় প্রতিবেদিত উপাত্ত-সমূহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যাচাই করা সম্ভব হবে না। তাই প্রত্যেক দেশেই National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকা বাঞ্ছনীয়। NCRP এর কাজ ICRP, ICRU, ILO ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক সুপারিশকৃত মূলনীতি অনুসারে স্ব স্ব দেশের উপযোগী কার্যপদ্ধতি, প্রয়োগবিধি, সর্বোচ্চ বিকিরণপাত মাত্রা, ডোজ সীমা (dose limits) ইত্যাদি স্থির করা ও কার্যকর করা।

৫.২ বিকিরণ নিরোধ বিধি ও ডোজ সীমা বেঁধে দেওয়ার যুক্তিযুক্ততা (Philosophy of radiation protection and dose limits)

প্রতিটি পেশার সাথেই কিছু না কিছু ঝুঁকি বা আপদ (hazard) অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে তা সে পেশা যত নিরাপদই হোক না কেন। যেমন রাস্তায় বেরোলেই দুর্ঘটনার ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। হাঁটাচলার দরুন সুস্বাস্থ্য লাভ থেকে শুরু করে অজস্র উপকার পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে কিছু খাওয়ার সময় মুখগহ্বরের কোমল ত্বক আহত হয়, কিন্তু খাবার থেকে বিরত থাকলে জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়ে। সব কিছুর উপরে জীবন আর জীবন রক্ষার্থেই তো এতো বিপুল আয়োজন। তাই যে কাজই করা হোক না কেন লাভালাভের অংশটা অবশ্যই দেখতে হবে। সব রকমের ক্ষতি ও ঝুঁকির হিসাবে যদি লাভের অংশটি বেশি থাকে তবেই সে কাজ গ্রহণযোগ্য অন্যথায় সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। প্রযুক্তিগত সুবিধা ভোগের সাথে তৎসংযুক্ত ঝুঁকিও পোহাতে হয় একথা আজ সর্বজনবিদিত।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টতই প্রতিভাত হয় যে বিকিরণ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদেরও কিছু না কিছু ঝুঁকি মেনে নিয়ে কাজ চালাতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে কতটুকু ঝুঁকি নেবেন একজন বিকিরণকর্মী। এর সোজা উত্তর অন্যান্য নিরাপদ পেশাজীবিগণের সমতুল্য ঝুঁকি নেবেন তিনিও। জনস্বাস্থ্য তথা পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি নবাগত উপাদানের ক্ষেত্রে এর সুনির্দিষ্ট পরিমাণে উপস্থিতিকে নিরাপদ পরিমাণ ধরা হয়, যা সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রা রূপে গ্রহণ করা হয়। তার পেছনে যুক্তি এই যে, দেহযন্ত্রের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিছু কিছু ক্ষয়ক্ষতি এবং বাহ্যিক বস্তুর উপস্থিতির দরুন সৃষ্ট বিরূপ প্রতিক্রিয়া আপনা থেকেই সারিয়ে তুলতে সক্ষম। সংশ্লিষ্ট উপাদান বা agent এর যে সর্বোচ্চ পরিমাণ বা মাত্রা যদ্দরুন উল্লেখযোগ্য কোনো শারীরিক

অসুস্থতা বা বৈকল্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে ততটুকুকে সর্বোচ্চ নিরাপদ পরিমাণ বা মাত্রা তথা ঝুঁকির প্রারম্ভ (threshold) মাত্রা ধরা হয়। তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও পদার্থ যা ক্যান্সার বা জন্মগত বৈকল্যের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে এমন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপদ মাত্রার যুক্তি খাটে না। এমতবস্থায় লাভালাভের ভিত্তিতে অনুমোদিত মাত্রা নিরূপিত হয়ে থাকে। লাভের অংশ বেশি হলেই শুধু তেজস্ক্রিয় বিকিরণ সংক্রান্ত কাজ অনুমোদনযোগ্য। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বেলায় দু'ধরনের প্রভাব লক্ষণীয়—(১) পরিমাণের সাথে সাথে প্রভাবের সম্ভাবনা বেড়ে চলে (non-threshold effect); এবং (২) নির্ধারিত পরিমাণ পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে না (threshold effect)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বেশির ভাগ লোকের ক্ষেত্রেই ০.২৫ গ্রে-এর কম ডোজে রক্তে কোনো পরিবর্তনই পরিলক্ষিত হয় না। ডোজের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে আনুপাতিক হারে প্রভাবও বেড়ে চলে এবং সম্ভাবনা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে।

জীবদেহে বিকিরণের প্রভাব বিষয়ে এ যাবৎ যত গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং যত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ও গভীরভাবে অনুধাবন করা হয়েছে অন্য কোনো রোগলক্ষণপুঞ্জ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী পরিবেশস্থ উৎপীড়ক (stressing agent) নিয়ে অদ্যাবধি ততটা ঘটে নি। বিকিরণ জীবদেহে কোন ক্রিয়া পদ্ধতিতে (mechanism) কি ধরনের কতটুকু ক্ষতি সাধন করে তা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা জেনে গেছেন ইতোমধ্যেই। উপরিউক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করে ICRP বিকিরণ-কর্মী ও জনসাধারণের জন্য বিকিরণ ডোজ সীমিতকরণ (dose limitation) পদ্ধতিসহ যে কোনো বিকিরণ প্রক্রিয়া সম্পাদনের পূর্বশর্ত হিসেবে নিম্নোক্ত তিনটি মূলনীতি পালনের সুপারিশ করেছে :

(১) কোনো বিকিরণ প্রক্রিয়া চালু করা যাবে না যদি আহৃত কল্যাণ তদোদ্ভূত সমুদয় ঝুঁকির চেয়ে অধিক না হয়।

(২) প্রক্রিয়াটির দরুন প্রাপ্ত সমুদয় বিকিরণপাত (exposure) যথাসম্ভব সর্বনিম্ন মাত্রায় (as low as reasonably achievable, সংক্ষেপে ALARA) রাখতে হবে। তদ্দরুন সৃষ্ট আর্থিক ও সামাজিক ক্ষয়ক্ষতিও হিসাবে আনতে হবে।

(৩) অবস্থা বিশেষের জন্য ICRP কর্তৃক সুপারিশকৃত মাত্রা-সীমা (dose limit) কোনো অবস্থাতেই ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

উল্লেখ্য যে উপরের দ্বিতীয় মূলনীতিতে বর্ণিত বক্তব্য জোরের সাথে বুঝাচ্ছে যে, যে কোনো বিকিরণ প্রক্রিয়া চালনাকালে অবশ্যই বিকিরণপাত যথাসম্ভব সর্বনিম্ন

রাখার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে এবং কোনো ক্রমেই সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে না। এ নীতি ALARA Principle নামে পরিচিত।

৫.৩ বিকিরণ নিরোধ ও নিরাপত্তার্থে প্রযোজ্য মূলনীতিমালা (Basic radiation safety criteria)

বিকিরণ নিরোধ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অনুসৃত মূলনীতিসমূহ আলোচনার পূর্বে এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পদসমূহের (terms) সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে এসব পদের কয়েকটি সংক্ষেপে বিবৃত হলো।

(১) অনুমোদিত মাত্রা (Permissible dose): কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ বিকিরণপাত (dose) গ্রহণ করলে ব্যক্তিবিশেষের জীবদ্দশায় লক্ষণীয় দৈহিক ক্ষতি ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে, ICRP তা গ্রহণযোগ্য বলে অনুমোদন করেছে। উক্ত পরিমাণকেই অনুমোদিত মাত্রা বলা হয়। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই শুধু বিকিরণপাতের (exposure) অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ঢালাওভাবে বিকিরণ প্রক্রিয়া অনুমোদিত নয়। অনুমোদিত প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ বিকিরণপাতেরও সুপারিশ করেছে ICRP। সর্বোচ্চ এ মাত্রাকেই সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রা (maximum permissible dose, সংক্ষেপে MPD) বলা হয়। জীবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব সম্পর্কে অদ্যাবধি প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ব্যক্তিবিশেষের দৈহিক (somatic) ও বংশগত (genetic) ক্ষতির সম্ভাবনা নেই এমন বিকিরণপাত মাত্রাকেই সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রা বলা হয়। বিকিরণকর্মীদের বেলায় তা সপ্তাহে ৪০ কর্মঘন্টায় (working hour) ১০০ মিলিরন্টগেন (mR) হিসাব অনুযায়ী প্রতি কর্মঘন্টায় ২.৫ মিলিরন্টগেন।

(২) বাৎসরিক তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণ-সীমা (Annual limits on intake, ALI): কোনো তেজস্ক্রিয় উপাদানের যেটুকু প্রতি বছরে দেহে গ্রহণ করলে একজন প্রমাণ-মানুষ (reference man) কর্তৃক প্রাপ্ত বিকিরণপাত যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুপারিশকৃত তদ্রূপ ক্ষেত্রের জন্য অনুমোদিত মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে না তাই সংশ্লিষ্ট উপাদানের জন্য বাৎসরিক তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণ-সীমা। সাধারণত শ্বসন, ত্বকের মাধ্যমে বিশোষণ, ইনজেকশন, খাদ্য, পানীয় ও ক্ষতের মাধ্যমে দেহে তেজস্ক্রিয় বস্তু গৃহীত হয়ে থাকে। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় উপাদানের জন্য এর পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন।

(৩) সংকট অঙ্গ (Critical organ): সাধারণভাবে দেহের সর্বাধিক সংবেদী তথা ক্ষতিপ্রবণ এবং একান্ত অপরিহার্য অঙ্গকে বুঝিয়ে থাকে। তবে বাস্তবে সর্বাধিক পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ সঞ্চয়কারী অঙ্গ বুঝায়। যেমন আয়োডিন গলগণ্ডে সর্বাধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়ে থাকে বলে গলগণ্ড আয়োডিনের সংকট অঙ্গ।

(৪) দৈহিক তেজস্ক্রিয়তা-ভার (Body radioactivity burden) : দেহে সঞ্চিত কোনো উপাদানের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণকে দৈহিক তেজস্ক্রিয়তা-ভার বলা হয়। কোনো তেজস্ক্রিয় উপাদানের সর্বাধিক যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেহে সঞ্চিত হলে জীবদ্দশায় (৭০ বছর আয়ুষ্কাল ধরে) তজ্জন্য লক্ষণীয় কোনো শারীরিক বৈকল্য বা বংশগত ক্ষতির সম্ভাবনা নেই ততটুকু পরিমাণকে সর্বোচ্চ অনুমোদিত দৈহিক তেজস্ক্রিয়তা-ভার বলা হয়। বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী (যেমন সক্রিয়তা, নির্গত শক্তির মান, কার্যকর অর্ধ-জীবন, সংকট অঙ্গ) এর পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

(৫) জৈবিক অর্ধজীবন (Biological half-life) : দেহে প্রবিষ্ট কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ যে সময়কালের মধ্যে দেহের সাধারণ বিপাকীয় ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে গিয়ে অর্ধেক বিদ্যমান থাকে সে সময়কালকে সংশ্লিষ্ট উপাদানটির জৈবিক অর্ধজীবন বলা হয়।

(৬) অনুমোদিত গাঢ়ত্ব (Permissible concentration) : খাদ্য, পানীয়, বাতাস, ইত্যাদি যা-ই দেহে প্রবেশ করে বা দেহের সংস্পর্শে আসে তাতেই কিছু না কিছু তেজস্ক্রিয়তা বিদ্যমান থাকে, তার পরিমাণ যতই হোক না কেন। এ সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেহে ক্রমাগত সঞ্চিত হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় খাদ্য ও পানীয়ে বিদ্যমান আয়োডিন গলগণ্ডে সঞ্চিত হয়, স্ট্রনশিয়াম, রেডিয়াম ইত্যাদি হাড়ে সঞ্চিত হয়, আয়রন যকৃতে গিয়ে জমা হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাই খাদ্য, পানীয়, বাতাস ইত্যাদিতে বিদ্যমান তেজস্ক্রিয় পদার্থের গাঢ়ত্ব এমন হওয়া দরকার যাতে করে এদের নির্ধারিত পরিমাণ (যেমন দৈনিক ১.৫ কেজি খাদ্য, ২.২ লিটার পানি এবং ২০ ঘনমিটার বাতাস) গ্রহণে জীবদ্দশায় এমন দৈহিক তেজস্ক্রিয়তা গুরুভারে পৌঁছে না যাতে সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রা অতিক্রম করে যায়। সর্বোচ্চ এমন গাঢ়ত্বকেই সর্বাধিক অনুমোদিত গাঢ়ত্ব (maximum permissible concentration, MPC) বলা হয়ে থাকে।

বিকিরণ নিরোধ ও নিরাপত্তার মান রক্ষার উদ্দেশ্যে ICRP বিকিরণপাত প্রাপ্তদের প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে, যথা :

(১) পেশাগত কার্য সম্পাদন-কালে প্রাপ্তবয়স্কদের দেহে সংঘটিত বিকিরণপাত ঃ এদেরকে বিকিরণ-কর্মীরূপে সনাক্ত করা চলে। বিকিরণ-কর্মীদের আবার ৩টি উপদলে ভাগ করা হয়েছে—

(ক) সন্তান ধারণক্ষম মহিলা বিকিরণ-কর্মী ;
(খ) গর্ভবতী মহিলা বিকিরণ-কর্মী ; ও
(গ) উপরিউক্ত দুই ধরনের বিকিরণ-কর্মী ব্যতীত অন্যান্য বিকিরণ-কর্মী।

(২) সাধারণ জনগোষ্ঠী ঃ এই শ্রেণীর আওতায় পড়ে

(ক) জনগোষ্ঠীর ব্যক্তি বিশেষ ও

(খ) জনগোষ্ঠীর উপদলসমূহ ; এবং

(৩) চিকিৎসাজনিত বিকিরণপাত ঃ এক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের উদ্দেশ্যে কারিগরি ও চিকিৎসা পারদর্শী এবং যথোপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে রোগীদের দেহে বিকিরণপাত ঘটানো হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাত্রা-সীমা চিকিৎসক ও বিকিরণ কলাকুশলীদের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বিকিরণ প্রয়োগকারীদের বিকিরণপাত অবশ্য এর আওতায় পড়ে না।

উপরিউক্ত যে কোনো শ্রেণীর ক্ষেত্রে বিকিরণপাতের জন্য ICRP বছরে কি পরিমাণ মাত্রাসম সীমা (dose equivalent limits) সুপারিশ করেছে তা বর্ণনার আগে আরো একটি বিষয় জেনে নেওয়া দরকার। উল্লেখ্য, দেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতজনিত প্রভাব দু'ধরনের, যথা : (১) প্রারম্ভিক (threshold) মাত্রা-সীমা অতিক্রান্ত হলে যে সকল ক্ষতিকর প্রভাব দেহে ছাপ ফেলে ; এসব প্রভাব threshold বা non-stochastic effect নামে পরিচিত, এবং (২) যে সকল ক্ষতিকর প্রভাব সংঘটনের সম্ভাবনা, নিম্নতম মাত্রা যত কমই হোক না কেন, সব সময়ই বিদ্যমান থাকে এবং মাত্রার পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে বেড়ে চলে ; এদের non-threshold বা stochastic effect বলা হয়ে থাকে। বিকিরণ-কর্মীদের বেলায় non-stochastic effects এড়ানোর জন্য ICRP বছরে নিম্নোক্ত মাত্রা-সীমা (dose limit) সুপারিশ করেছে :

(ক) চোখের লেন্স ব্যতীত অন্যান্য কোষকলার (tissue) জন্য বছরে ০.৫ সিভার্ট (৫০ রেম)।

(খ) চোখের লেন্সের ক্ষেত্রে ০.১৫ সিভার্ট (১৫ রেম)।

সারা অঙ্গই হোক বা কোষকলা এককভাবেই বিকিরণপ্রাপ্ত হোক না কেন এ মাত্রা-সীমা সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বিকিরণ পেশাজীবীদের জন্য সর্বাঙ্গে সুষম বিকিরণপাতের বেলায় stochastic effect সীমিতকরণের খাতিরে বছরে অনুমোদিত মাত্রাসম হচ্ছে ৫০ মিলিসিভার্ট (৫ রেম)।

গর্ভবতী বিকিরণ-কর্মীদের বেলায় বিকিরণপাত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মীদের $\frac{৩}{১০}$ অংশের বেশি হওয়া উচিত নয়।

৫.৪ কার্যকর মাত্রা-সমতুল (Effective dose equivalent)

বিকিরণ নিরাপত্তায় নিয়োজিত মান (standard) প্রতিষ্ঠার খাতিরে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, কোনো কোষকলার stochastic ঝুঁকির সম্ভাবনা সংশ্লিষ্ট কোষকলার মাত্রা-সমতুলের সমানুপাতিক হয়ে থাকে। কিন্তু সকল কোষকলা বিকিরণের প্রতি সমসংবেদী নয় অর্থাৎ এক এক ধরনের কোষকলার জন্য সংবেদিতা তথা ক্ষতির আনুপাতিক গুণাঙ্ক (proportionality factor) এক এক রকম হয়ে থাকে। কতিপয় কোষকলার উপর বিকিরণজনিত stochastic effect এর সিভার্ট-প্রতি ঝুঁকি ৫.১ সারণিতে দেখানো হলো। সারা-দেহে সমভাবে বিকিরণপাত ঘটলে সার্বিক ঝুঁকির হার একই হয়ে থাকে। কিন্তু অসম বিকিরণপাতের ক্ষেত্রে (যেমন বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ সঞ্চিত হলে) আপেক্ষিক সংবেদিতা অনুযায়ী ওজন গুণাঙ্ক (weighting factor) ধরে ঝুঁকির মান নিরূপণ করা হয়ে থাকে (সারণি ৫.১)। কার্যকর মাত্রা সমতুলকে নিম্নোক্ত গাণিতিক সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয়:

$$H_\epsilon = \Sigma W_T H_T$$

যেখানে $W_T \rightarrow$ কোষকলা 'T' এর জন্য ওজন গুণাঙ্ক এবং

$H_T \rightarrow$ কোষকলা 'T' এর মাত্রাসম।

সারণি ৫.১: Stochastic effects এর দরুন ঝুঁকি গুণাঙ্ক ও ওজন গুণাঙ্ক (risk factor & weighting factor)

কোষকলা	ঝুঁকি Sv^{-1}	W_T
প্রজনন কলা	8.0×10^{-3} পরপর দুই পুরুষ পর্যন্ত	০.২৫
স্তন	2.5×10^{-3} সব বয়সের নারী-পুরুষের জন্য	০.১৫
অস্থিমজ্জা	2.0×10^{-3} রক্তের ক্যান্সার	০.১২
ফুসফুস	2.0×10^{-3} ক্যান্সার	০.১২
গলগণ্ড	5.0×10^{-4} মারাত্মক ক্যান্সার	০.০৩
অস্থি-উপরিতল	5.0×10^{-4} হাড়ের ক্যান্সার	০.০৩
অবশিষ্টাংশ	5.0×10^{-2} ক্যান্সার	০.৩০
সর্বমোট ঝুঁকি	1.65×10^{-2}	১.০০

৫.৫ বিকিরণপাতের ধরন

জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিবিশেষের বিকিরণপাত: সাধারণ জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিবিশেষের জন্য ICRP পেশাজীবীদের জন্য সুপারিশকৃত বিকিরণমাত্রার এক-দশমাংশ অর্থাৎ

বছরে ৫ মিলিসিভার্ট (mSv) সীমা বেঁধে দিয়েছে। ধারণা করা হয়েছে যে বিকিরণ-পাত প্রাপ্তদের গড় মাত্রা এর নিচেই থেকে যাবে।

জনগোষ্ঠীর বিকিরণপাত ঃ জনগোষ্ঠীর জন্য ICRP কোনো বিশেষ মাত্রা সীমা বেঁধে দেয়নি। বরঞ্চ বিকিরণপাতে সৃষ্ট কল্যাণ বনাম বিরূপ প্রভাবের বিবেচনায় কল্যাণের পাল্লা ভারি হলেই বিকিরণ প্রক্রিয়াটি চালু থাকা উচিত।

চিকিৎসাজনিত বিকিরণপাত ঃ এ ক্ষেত্রে ICRP কোনো সুনির্দিষ্ট মাত্রা-সীমা বেঁধে দেয় নি। এ ব্যাপারে কল্যাণ বিবেচনায় উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক সুপারিশ-কৃত বিকিরণপাত সংঘটনের অনুমোদন রয়েছে।

৫.৬ তেজস্ক্রিয় উপাদান শারীরিকরণের অনুমোদনযোগ্য সীমা (Allowable limit on intake, ALI)

ICRP এর সাম্প্রতিক সুপারিশমালায় বিকিরণ নিরোধের জন্য সর্বোচ্চ অনুমোদিত দৈহিক ভার (maximum permissible body, burden, MPBB) বা সর্বাধিক অনুমোদিত গাঢ়ত্ব (maximum permissible concentration, MPC) বলে কিছু আর আজকাল উল্লেখ থাকে না। তদ্স্থলে আজকাল কোনো তেজস্ক্রিয় উপাদান (radionuclide) দেহে গ্রহণের বাৎসরিক পরিমাণের সীমার (annual limit on intake, ALI) মান উল্লেখ করা হয়ে থাকে। stochastic ও non-stochastic effects বিচারে একই তেজস্ক্রিয় উপাদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ALI-এর মান রয়েছে। বছরে যতটুকু তেজস্ক্রিয় বস্তু শরীরে গ্রহণ করলে (৫০ বছরের কর্মজীবনে, ৭০ বছরের জীবদ্দশায়) ৫০ মিলিসিভার্ট (৫ রেম) মাত্রা সমতুল ছাড়িয়ে যাবে না ততটুকু সংশ্লিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থকে ALI-এর মান ধরা হয়ে থাকে। এককভাবে কোনো অঙ্গ বা কোষকলার জন্য এর মান ৫০০ মিলিসিভার্ট বা ৫০ রেম ছাড়িয়ে যাওয়া চলবে না। গাণিতিকভাবে তা নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়।

$$\sum_T W_T H_{\delta 0,T} \leq 0.05 \text{ Sv for stochastic effects}$$

$$H_{\delta 0,T} \leq 0.5 \text{ Sv for all T, for non-stochastic effect}$$

যেখানে W_T হচ্ছে ওজন গুণাঙ্ক (weighting factor) (সারণি ৫.১) এবং $H_{\delta 0,T}$ হচ্ছে ঐ বছরে দেহে গৃহীত সমুদয় তেজস্ক্রিয় উপাদান থেকে কোষকলা 'T' তে প্রাপ্ত মাত্রা-সমতুল। উল্লেখ্য যে উক্ত ALI-র মান বছরব্যাপী গ্রহণের বেলায় প্রযোজ্য; গ্রহণ ঘটতে পারে একবারে বা অল্প অল্প করে সারা বছরব্যাপী।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এবং বস্তুর নিরাপদ চালনা ও ব্যবহার
(Safe handling and use of ionizing radiation and radionuclides)

৬.১ ভূমিকা

অনুমোদিত মাত্রার অধিক তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাত জীবদেহ ও জড়বস্তুতে লক্ষণীয় পরিবর্তন আনয়ন করে থাকে। তাই তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও বস্তু চালনাকালে (handling) তদোদ্ভূত ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানোর জন্য সদাসতর্ক থাকতে হবে এবং নিরাপদ চালনার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিনির্দেশিত ও সুপারিশকৃত বিধানাবলী অনুসরণ করে কার্য পরিচালনা করতে হবে। জীবদেহে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ অনুভব করার উপযোগী কোনো ইন্দ্রিয় নেই বিধায় বিকিরণ-কর্মীদের দেহে প্রাপ্ত বিকিরণপাতের পরিমাণ উপযুক্ত ডিটেক্টর দ্বারা পরিমাপনের সুব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জনসাধারণকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য পরিবেশস্থ বিকিরণের হ্রাসবৃদ্ধি পর্যানুসরণ (monitor) করতে হবে। তদুপরি বিকিরণ-কর্মীদেরকে বিকিরণ কি, বিকিরণের বৈশিষ্ট্য, জীবদেহে বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব এবং ক্ষতিকর প্রভাব এড়ানোর জন্য বিকিরণ-উৎস নিরাপদে চালনা ও ব্যবহারের জন্য বিনির্দেশিত বিধানাবলী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ওয়াকেফহাল করে তুলতে হবে।

বিকিরণ নিরোধ যদিও জীবজগতের প্রতিই বিশেষভাবে প্রযোজ্য তথাপি উপকারী তরুলতা ও জড়বস্তুরও নিরাপত্তা বিধান করা আবশ্যকীয়। যেমন আলোকচিত্র ও রঞ্জনরশ্মি ফিল্ম (X-ray film) এবং বিকিরণ নিরূপণে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিও বিকিরণ নিরোধের আওতায় পড়ে। অন্যথায় এগুলি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

বিকিরণপাতের জন্য নিয়োজিত তেজস্ক্রিয় উৎসটির সক্রিয়তা (activity) অতি উচ্চ (যেমন পারমাণবিক প্লান্টে লক্ষ লক্ষ কুরি হয়ে থাকে) থেকে অতীব নিম্ন (যেমন পারমাণবিক চিকিৎসায় এক কুরির লক্ষাংশেরও কম) পর্যায়ের হতে পারে। নিরাপদ চালনার মূলনীতি সর্বক্ষেত্রে একই, কিন্তু নিয়ন্ত্রণবিধি ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের হয়ে থাকে। প্রথমত বিকিরণ-উৎসটিকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদি ও মনিটরিং সুবিধার আওতাধীনে নিতে হয়। অতঃপর উহা চালনা (operation)

করার ফলে উৎপাদিত বর্জ্যাদির নিরাপদ অপসারণ ও ব্যবস্থাপনার দিকে নজর রাখতে হয়। তজ্জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সংগ্রহ ও পরিকল্পনা পূর্বাহ্নেই সম্পন্ন করা দরকার। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য বিকিরণ-কর্মীদের পূর্বাহ্নেই অবহিত করতে হয়।

৬.২ তেজস্ক্রিয় উৎস চালনাকালে উদ্ভূত আপদ (Hazards in handling radioactive source)

তেজস্ক্রিয় উৎস থেকে নিঃসৃত তেজস্ক্রিয় বিকিরণই আপদের মূল কারণ। তেজস্ক্রিয় উৎসটির অবস্থানের উপর নির্ভর করে বিকিরণপাতের ধরন, পরিমাণ ও প্রকৃতি। তেজস্ক্রিয় উৎসটির অবস্থান হতে পারে দেহাভ্যন্তরে অথবা দেহের বাইরে। দেহাভ্যন্তরস্থ তেজস্ক্রিয় উৎস সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ, কেননা উহা সারাক্ষণ দেহে বিকিরণপাত ঘটিয়ে চলে। তাই চালনাকালে অতি সতর্ক থাকতে হবে যাতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ কোনোভাবেই দেহে প্রবেশ করতে না পারে। দেহে প্রবিষ্ট তেজস্ক্রিয় উপাদান বিপাকক্রিয়ার মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ অঙ্গে সঞ্চিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আয়োডিন গলগণ্ডে সঞ্চিত হয়, স্ট্রনশিয়াম, রেডিয়াম, প্লুটোনিয়াম ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে থাকে হাড়ে।

৬.৩ দেহবহিঃস্থ বিকিরণ-উৎস থেকে উদ্ভূত আপদ নিয়ন্ত্রণ (Control of hazards arising from external sources)

দেহে বিকিরণের প্রভাব নির্ভর করে বিকিরণের ধরন, ইহার শক্তি ও বিদারণ ক্ষমতা, বিকিরণপাতের পরিমাণ, বিকিরণপ্রাপ্ত অঙ্গ এবং দেহের শারীরবৃত্তীয় অবস্থার উপর। কোনো বিকিরণ-উৎস থেকে প্রাপ্ত বিকিরণপাতের পরিমাণ তিনটি উপাদান (factor) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, যথা—

(১) বিকিরণ-উৎস হতে দূরত্ব (distance) : আমরা জানি যে কোনো স্থানে বিকিরণের তীব্রতা বিকিরণ উৎস হতে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। তাই দূরত্ব যত বেশি হবে বিকিরণপাতের পরিমাণও দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে ততই হ্রাস পাবে। যেমন কোনো সুনির্দিষ্ট বিকিরণ-উৎস থেকে 1 m দূরত্বে বিকিরণপাতের হার 82.5 mR/h হলে, 2.6m দূরত্বে বিদ্যমান বিকিরণপাতের হার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক সূত্র থেকে নিম্নরূপে পাওয়া যায়:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{d_2^2}{d_1^2},$$

যেখানে I_1 ও I_2 যথাক্রমে d_1 ও d_2 দূরত্বে বিদ্যমান বিকিরণপাত।

এখানে $I_1 = 82.5$ mR/h, $d_1 = 1$m, $d_2 = 2.6$ m, $I_2 = ?$

সূত্রটিতে মান বসিয়ে আমরা পাই $I_2 = 12.2$ mR/h যা কিনা I_1 এর $(2.6)^2 = 6.76$ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

(২) বিকিরণপাতের সময়কাল (duration) : প্রাপ্ত বিকিরণপাতের পরিমাণ সময়কালের সমানুপাতিক। তদনুযায়ী

মোট বিকিরণপাত = বিকিরণপাতের হার × সময়কাল।

তাই অতীব তীব্র সক্রিয় (active) বিকিরণ উৎস নিয়ে কাজ করার সময় বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে সময় ভাগ করে কাজ চালানো যায়। তাতে করে এককভাবে কেউ মাত্রাতিরিক্ত বিকিরণপাতগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। যেমন কোনো রেডিওগ্রাফারকে 0.25 m Sv/h বিকিরণ ক্ষেত্রে কাজ করার সময় (সপ্তাহে পাঁচদিন কর্মদিবস ধরে) অনুমোদিত বিকিরণপাতের আওতায় (1mSv) থেকে কাজ করতে হলে দৈনিক ৪৮ মিঃ কাজ করতে পারবেন। তদনুযায়ী মোট দশজন রেডিওগ্রাফার নিয়োগ করলে প্রত্যেকে দৈনিক ৪৮ মিঃ পালাক্রমে কাজ করে লাগাতার কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব।

(৩) বিকিরণ-উৎস আবরণী (radioactive source shielding) : বিকিরণ উৎসকে ভারি উপাদানে (সীসা, পারদ, লোহা, ইত্যাদি) তৈরি আবরণী দিয়ে ঢেকে দিলে উৎস হতে নিঃসৃত বিকিরণ প্রতিহত হয়। আবরণী ব্যবহার করে আলফা- ও বিটা-বিকিরণ রোধ করা চলে ; কিন্তু গামা-রশ্মিকে কোনো কিছু দ্বারাই সম্পূর্ণ প্রতিহত করা যায় না। কারণ ইহার বিদারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। তবে দূরত্ব, সময়কাল ও আবরণী এ তিনটি ব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে এর তীব্রতা অনুমোদনযোগ্য মাত্রায় নামিয়ে আনা সম্ভব। যথা : 3.7×10^4 MBq (1Ci) ^{137}Cs উৎস থেকে 1 m দূরত্বে বিকিরণপাত 2890×10^{-6} Sv/h ; উৎসটিকে 0.0443 m পুরু Pb (সীসা) এর পাত দিয়ে আচ্ছাদিত করে দিলে তা প্রায় ১১৬ গুণ হ্রাস পেয়ে থাকে অর্থাৎ 25×10^{-6} Sv/h এ নেমে আসে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাত্রয়ের মধ্যে পারতপক্ষে বিকিরণ-উৎস থেকে দূরে থাকাই বিকিরণ নিরোধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা। বিকিরণ-উৎস চালনাকালে দূরনিয়ন্ত্রণ (remote control) ব্যবস্থা প্রয়োগ একান্তই বাঞ্ছনীয়। এতদুদ্দেশ্যে টংস (tongs) বা লম্বা হাতলওয়ালা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা উচিত। কোনো অবস্থাতেই তেজস্ক্রিয় পদার্থ হাত দিয়ে ধরা উচিত নয়। এমন কি চিমটির সাহায্যে নাড়াচাড়া করলে চামড়ায় প্রাপ্ত বিকিরণ সরাসরি হাত দিয়ে ধরার চেয়ে বহুগুণে কমে আসে।

৬.৪ অভ্যন্তরীণ বিকিরণ-উৎস, বিকিরণপাত এবং তৎসমুদয় নিয়ন্ত্রণ

আমাদের চারপাশের পরিবেশে তথা খাদ্য, পানীয়, বাতাস সর্বত্রই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বিকিরণ-উৎস তথা তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এদের নিয়েই জীবজগত। খাদ্য, পানীয়, শ্বসন বা গাত্র চর্ম দিয়ে শোষণের ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেহাভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ আজ মানব কল্যাণে অহরহ ব্যবহৃত হচ্ছে। পানির ধারেকাছে না গিয়ে যেমন মাছ ধরা যায় না তেমনি তেজস্ক্রিয় বস্তু নাড়াচাড়া না করেও তা কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার সম্ভব নয়। কিছু না কিছু ঝুঁকিও নিতে হবে। এখন প্রশ্ন উঠে কতটুকু ঝুঁকি নেওয়া উচিত আর কিভাবেই বা ঝুঁকি সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা যায়। ঝুঁকির পরিমাণ সর্বনিম্ন রাখার জন্য করণীয় কতিপয় সতর্কতামূলক (precautionary) ব্যবস্থার উল্লেখ এখানে করা হলো।

(১) গবেষণাগারে সর্বদা এপ্রোন গায়ে রাখতে হবে।

(২) কোনো অপ্রয়োজনীয় বস্তু গবেষণাগারে আনা বা মজুত করা যাবে না।

(৩) তেজস্ক্রিয় পদার্থ গুদামজাতকরণ ও স্থানান্তরণের কাজ একজন অভিজ্ঞ বিকিরণ নিরোধ কর্মকর্তার সতর্ক তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) তাৎক্ষণিকভাবে তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপণ করা যাবে এরূপ তৈরি নমুনাই শুধু তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণাগারে নিয়ে আসা উচিত এবং গণনা শেষে তেজস্ক্রিয় পদার্থ মজুত রাখার স্থানে রেখে দেওয়া দরকার।

(৫) তেজস্ক্রিয় বস্তু নাড়াচাড়া করা হয় এমন সকল স্থানে সব রকমের খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৬) পিপেট (pipette), ওয়াশ বোতল (wash bottle), লেবেল (label) ইত্যাদি মুখে লাগানো চলবে না।

(৭) তরল ও গ্যাসীয় তেজস্ক্রিয় বর্জ্যাদি সুনির্ধারিত, সুচিহ্নিত, বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত লেবেলযুক্ত, অভঙ্গুর ও দ্বি-স্তরবিশিষ্ট (double layered) আধারে রাখতে হবে। এতে দুর্ঘটনাজনিত কারণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

(৮) খোলা (unsealed) তেজস্ক্রিয় বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় হাতে গ্লাভস (gloves), নাকে-মুখে মুখোশ, চোখে সীসার তৈরি গগলস (goggles) পরিধান করা দরকার।

(৯) কাজ শেষে হাতের গ্লোভস্, এপ্রোন, যন্ত্রপাতি, বেঞ্চ, ইত্যাদিতে তেজস্ক্রিয়তা-দূষণ (contaminations) ঘটেছে কিনা তা যথোপযুক্ত সার্ভেমিটার (survey meter) দ্বারা পরখ করে দেখতে হবে। তেজস্ক্রিয়তা-দূষণ ধরা পড়লে তা অপসারণ (decontaminate) করে অনুমোদিত মাত্রায় আনতে হবে।

(১০) দেহগাত্রে কোনো ক্ষত, কাঁটা বা চামড়া ফাটা থাকলে বা স্বক ছিলে গিয়ে থাকলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করা উচিত নয়।

(১১) কোনো জায়গায় বিরাজমান তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা অনুসারে অঞ্চল (zone) বা এলাকায় ভাগ করে চিহ্নিত করতে হবে এবং তদনুযায়ী চলাচল, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেন কেউ অযথা বা অনুমোদিত মাত্রার

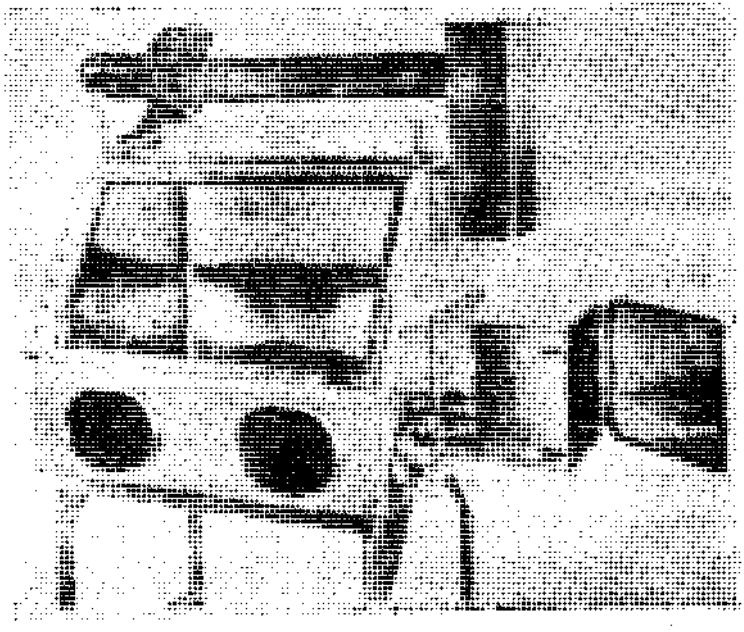

চিত্র ৬.১ঃ গ্লোভস বক্স

অধিক বিকিরণপাত না পায়। তেজস্ক্রিয়তা-দূষণ ঘটতে পারে এমন এলাকার জন্য আলাদা পরিধেয় বস্ত্র, জুতা, পরিত্যাজ্য (disposable) পোশাক ইত্যাদি থাকতে হবে। এগুলো অন্য এলাকায় বা বাইরে নেওয়া চলবে না। বহির্গমনকালে

হাতে, পায়ে বা গায়ে কোথায়ও তেজস্ক্রিয়তা-দূষণ ঘটেছে কিনা তা উপযুক্ত মনিটর দ্বারা জরিপ করে দেখতে হবে।

(১২) বায়ু বাহিত তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ কর্মস্থলে কোথায়ও সর্বোচ্চ অনুমোদিত গাঢ়ত্বের সীমা (Maximum Permissible Concentration, MPC) ছাড়িয়ে গেলে বুট, গ্লোভস, সীসার গগল্‌স, শিরস্ত্রাণ, ইত্যাদিসহ রাবার স্যুট পরিধান করতে হবে। এতে বিশুদ্ধ বাতাস সরবরাহের ব্যবস্থাদি থাকতে হবে।

(১৩) সমুদয় তেজস্ক্রিয় বস্তু গ্লোভ-বক্স (Glove box)-এর (চিত্র ৬.১) ভিতরে রেখে দূর নিয়ন্ত্রণ (remote control) ব্যবস্থার সাহায্যে নাড়াচাড়া করতে হবে। এমতাবস্থায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ কার্যস্থলের বাতাসে বা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

(১৪) এলাকা তেজস্ক্রিয়তা মনিটর (Area radioactivity monitor) দ্বারা জরিপ করে তথায় বিদ্যমান তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা সদা পর্যবেক্ষণ করা দরকার। অনুমোদিত তেজস্ক্রিয়তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই শব্দ ও আলোর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(১৫) তেজস্ক্রিয় উৎস নিয়ে কাজ করার সময় অথবা পরিদর্শন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তেজস্ক্রিয় এলাকায় প্রবেশ করলে তাৎক্ষণিকভাবে বিকিরণপাতের পরিমাণ জানার জন্য পকেট আয়নায়ন (Pocket ionization) চেম্বার সঙ্গে নিতে হবে। কাজ শেষে বা তেজস্ক্রিয় অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসার পর বিকিরণপাত মাত্রা রেকর্ড করে নেওয়া দরকার।

(১৬) তেজস্ক্রিয় এলাকায়, তেজস্ক্রিয় বস্তুর গায়ে ও বাহনের গায়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্দেশক লেবেল (label) সেঁটে দিতে হবে। ফলে তথায় গমনাগমনকারী সকলে উক্ত লেবেল দেখা মাত্রই সতর্কতা অবলম্বনে সক্ষম হবে।

(১৭) আবদ্ধ (sealed) তেজস্ক্রিয় উৎস ও প্রমাণ (standard) তেজস্ক্রিয় বস্তুর আধারের (container) গায়ে তারিখসহ সক্রিয়তা, অর্ধজীবন, নিঃসৃত শক্তি ও বিপদ সংকেত সম্বলিত লেবেলে সকল বিবরণ স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকতে হবে। পর্যাপ্ত আবরণীর (shielding) ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন আধারের বহির্গাত্রে অনুমোদিত মাত্রার অধিক তেজস্ক্রিয়তা বা মাত্রা না থাকে।

৬.৫ ভৌত রক্ষণাবেক্ষণ (Physical maintenance)

এ বিষয়ে দু'টি প্রধান সমস্যা মোকাবেলা তথা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, যথা—

(১) দেহঃবহিস্থ কোনো তেজস্ক্রিয়-উৎস থেকে কোনোক্রমেই অতিবিকিরণপাত (overexposure) ঘটতে দেওয়া উচিত নয়।

(২) দেহাভ্যন্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অনুপ্রবেশ যে কোনো মূল্যে রোধ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে। দুর্ঘটনাক্রমে দেহে তা ঢুকে পড়েছে কিনা বা হাতে, পায়ে বা গায়ে তেজস্ক্রিয়াদুষ্টি ঘটেছে কিনা কাজ শেষে তা মনিটর দিয়ে দেখে নিতে হবে। দেহে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উক্ত পদার্থ আবদ্ধ করে রাখতে হবে যেন কোনোমতেই বাইরে আসতে না পারে। তজ্জন্য অনাবদ্ধ (unsealed) তেজস্ক্রিয় পদার্থ চালনাকালে উহা ফিউম হুড (fume hood)-এর মধ্যে রেখে দূরনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। গবেষণাগারে অবশ্যই বায়ু চলাচলের সুব্যবস্থা থাকতে হবে। গায়ে বাড়তি পোশাক যেমন এপ্রোন নিজকে রক্ষণাবেক্ষণের বাড়তি সুবিধা দান করে, কেননা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া পদার্থ সরাসরি দেহের সংস্পর্শে আসতে পারে না। এমতাবস্থায় গবেষণাগারের মেঝে, দেওয়াল, বেঞ্চি, আসবাবপত্র, ইত্যাদি প্রতিস্থাপনযোগ্য (replaceable) বস্তু যেমন টালি, প্লাস্টিক, ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে দেওয়া যেতে পারে। তাতে প্রয়োজনে এগুলো সরিয়ে ফেলে নতুন করে ঢেকে দেওয়া যায়। গবেষণাগারের পরিকল্পনা ও ডিজাইন এমন হওয়া দরকার যেন প্রয়োজনে ধুয়ে মুছে বা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয়তা দূষণমুক্ত করা যায়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ন্ত্রণে রাখার পূর্বশর্তসমূহের অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে বিকিরণ ডিটেক্টর ও সার্ভেমিটার প্রাপ্যতা এবং গর্ত (bunker) অথবা ভারি উপাদান যথা সীসা, লোহা, কংক্রিট ইত্যাদির তৈরি আবরণীতে (shield) আবদ্ধ করে নির্জন স্থানে রাখা এবং প্রয়োজনবোধে সেখান থেকে নিয়ে কাজ শেষে সাথে সাথেই আবার উক্ত সুনির্ধারিত স্থানে রেখে দেওয়া। অতএব অগোছালোভাবে কখনোই তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং জঞ্জাল বেখেয়ালীভাবে রাখা উচিত নয়। এর ফলে যে কোনো সময় বড় রকমের যে কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে। বছর চার পাঁচ আগে একবার ব্রাজিলের জিওনিয়া (Gionia) শহরে একখানা টেলিথেরাপি-উৎস পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা কালে পুরনো লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে। তারা বুঝতে না পেরে সেটি ভেঙ্গে ফেলে। এর ফলে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম। এতে কয়েক ব্যক্তির মৃত্যুসহ ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। অতএব তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কিত সকল কাজে সাবধান থাকা অপরিহার্য।

গবেষণাগারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও ডিজাইনের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় বিকিরণপাত সহজেই পরিহার করা যায়। দুর্ঘটনাজনিত বিকিরণপাত এড়াতে ও সিকিরণ-সম্বলিত কর্মসম্পাদনে বিকিরণপাত সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য বিকিরণ ডিটেক্টর ও সার্ভেমিটার সর্বদা হাতের কাছে রাখতে হবে।

৬.৬ বিকিরণ উৎস অন্তরীণকরণ ও নির্মল বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা গ্রহণ (Radioactive source containment and ventilation)

অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্যায়ের অনাবদ্ধ (unsealed) তেজস্ক্রিয়-উৎস (~ মাইক্রো কুরি সক্রিয়তার পর্যায়ে) নিয়ে কাজ করার সময় রসায়নাগারে সচরাচর ব্যবহৃত fume hood এর ভেতরে রেখে নাড়াচাড়ার কাজ সম্পন্ন করলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া তেজস্ক্রিয় পদার্থ তথায় ধরে রাখা সম্ভব। ফলে পরিবেশ তথা গবেষণাগারে ও কর্মীদের তেজস্ক্রিয়তা-দূষণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। এ ক্ষেত্রে বায়ুচলাচলের (ventilation) ব্যবস্থাটি এমন হতে হবে যে বাতাসে মিশে যাওয়া তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ গবেষণাগারের বাইরে যেন বেশ উঁচুতে প্রবাহিত হয়ে চলে যেতে পারে।

(ক) গ্লোভ বাক্স (Glove box) ঃ আলফা-রশ্মি ও অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর বিটা-রশ্মি উচ্চ তেজস্ক্রিয়তা মাত্রার হলেও বদ্ধ আধারে পরিচালনা করা চলে। এ ধরনের আধার (container) গ্লোভ বক্স নামে পরিচিত।

(খ) বায়ু নির্গমন সিস্টেম (Exhaust system) ঃ বায়ু নির্গমন পথ বেশ উঁচুতে স্থাপন করা দরকার। অন্যথায় fume hood এ সঞ্চিত তেজস্ক্রিয় কণিকা গবেষণাগারের ভিতরে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

৬.৭ নিরোধক পরিচ্ছদ (Protective clothing)

আসন্ন বিপদের আশঙ্কা রয়েছে এমন মাত্রায় তেজস্ক্রিয়তা পরিবেশে থাকলে, সেখানে কাজ করার সময় নিরোধক পোশাক ব্যবহার করা আবশ্যক। পোশাকটি এমন হওয়া উচিত যা সহজেই ধৌত করা বা বিনষ্ট করা যায়। এমনও হতে পারে যে পোশাকটি শুধু একবারই ব্যবহার্য। উক্ত পোশাক কেমন হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট তেজস্ক্রিয় বস্তুর ধরন, পরিমাণ, চালনাপদ্ধতি, গবেষণাগারের ডিজাইন এবং বিকিরণ পরিমাপন ও জরিপের জন্য প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাদির উপর। অবস্থাভেদে সচরাচর নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়ে থাকে।

(ক) পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ উক্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে ICRP কর্তৃক সর্বাধিক অনুমোদিত দৈহিক ভারের (maxinum permissible body burden, MPBB) চেয়ে পরিমাণে কম হলে নিরোধমূলক পরিচ্ছদ ব্যবহার না করলেও চলে, কিন্তু তদ্‌তিরিক্ত হলে অবশ্যই নিরাপত্তামূলক পোশাক ব্যবহার করতে হবে।

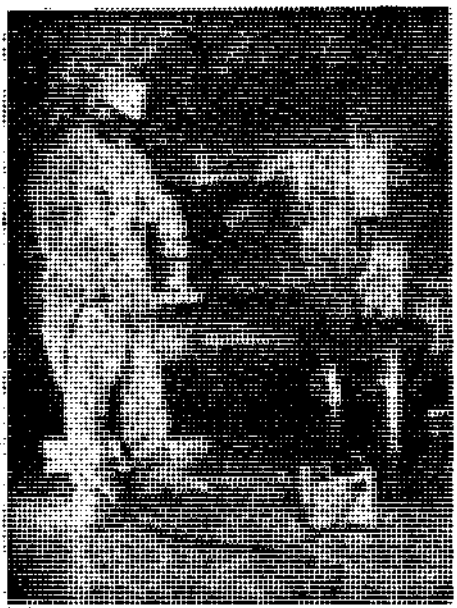

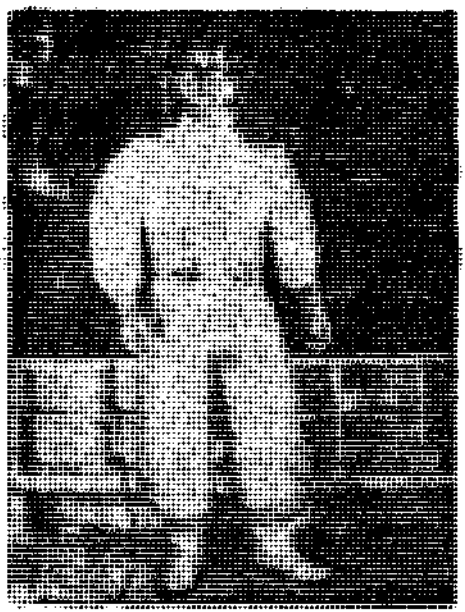

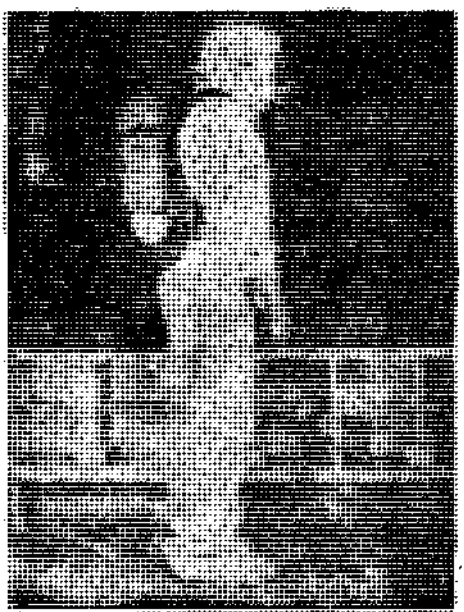

চিত্র ৬.২ঃ তেজস্ক্রিয়তা রোধে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের পোষাক।

(খ) শ্বাসের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রবেশ নিরোধ (Respiratory protection) ঃ পরিবেশস্থ বাতাসে তেজস্ক্রিয় পদার্থের গাঢ়ত্ব অনুমোদিত মাত্রার অধিক হলে বিকিরণ নিরোধের প্রয়োজনে মুখোশ ব্যবহার করা আবশ্যকীয়। মুখোশে যথোপযুক্ত ছাঁকনি দ্বারা ছেঁকে তেজস্ক্রিয় কণিকা আলাদা করে ফেলার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এভাবে শ্বসনের মাধ্যমে সংঘটিত বিকিরণপাত ও দূষণ এড়ানো সম্ভব।

(গ) আবরণীযুক্ত পোশাক (Shielded garments) ঃ অপেক্ষাকৃত স্বল্প অনুপ্রবেশক্ষম তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে থেকে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময় ধরে কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ বিকিরণ-আবরণী পোশাক যেমন চামড়ার তৈরি পরিচ্ছদ, সীসার তৈরি দস্তানা, এপ্রোন ও চশমা ব্যবহার করতে হবে।

(ঘ) গবেষণাগার ডিজাইন ও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যবস্থাপনা ঃ যে স্থানে বা এলাকায় অনাবদ্ধ (unsealed) তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করা হয় সেখানকার মেঝে, বেঞ্চি, আসবাবপত্র, ফিউমহুড ইত্যাদি ব্যবহার্য দ্রব্যের উপরিগাত্র সহজেই সরিয়ে পুনঃস্থাপন করা যায় এমন অথচ অপ্রবেশ্য বস্তু যেমন টালি, প্লাস্টিক শিট ইত্যাদি দ্বারা আবৃত করে দিতে হবে। এতে তেজস্ক্রিয়তা-দূষণ সহজে ছড়িয়ে পড়বে না এবং নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ হবে। কোথাও তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লে টালি বা প্লাস্টিক শিট সরিয়ে নিয়ে আরেকটি পুনঃস্থাপন করলেই তেজস্ক্রিয়তা-দূষণ সম্ভাবনা অন্তর্হিত হয়।

অহেতুক বিকিরণপাত এড়ানোর জন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্পূর্ণ আলাদা জায়গায় গুদামজাত করে রাখা দরকার। নিরাপদ চালনার খাতিরে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ ও নাড়াচাড়া করা আবশ্যক। তজ্জন্য চিমটি, সাড়াশি, ট্রে ও অন্যান্য উপযুক্ত ধারকপাত্র ব্যবহার করা উচিত। স্থানান্তরণকালে তেজস্ক্রিয় উৎসকে সীসার তৈরি বহনযোগ্য আধারে আবদ্ধ করে আনা-নেওয়া করা দরকার।

৬.৮ বিকিরণ প্রতিষ্ঠানাদি ও উৎস মওজুদাগারের আলাদা অবস্থান (Isolation of nuclear facilities and storage)

পারমাণবিক প্রতিষ্ঠানাদি, গবেষণাগার ও উৎস মওজুদাগারের আশেপাশে ও গায়ে বিকিরণ ঝুঁকি নির্দেশক সতর্কীকরণ চিহ্নাদি সহজে সর্বসাধারণের চোখে পড়ার মতো স্থানসমূহে সেঁটে দিতে হবে। এর ফলে যারা সেখানে যাওয়া-আসা করেন তাঁরা বিকিরণপাত ও বিকিরণ-দূষণের আশঙ্কা রয়েছে জেনে প্রয়োজনীয় সতর্কতা

অবলম্বন করতে পারবে। সমুদয় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ-উৎস কাজের অব্যবহিত পূর্বে মওজুদাগার থেকে কার্যস্থলে আনতে হবে এবং কার্য শেষ হওয়ার সাথে সাথেই নিরাপদ মওজুদাগারে সুনির্ধারিত স্থানে রেখে আসতে হবে। এমতাবস্থায় অযথা বিকিরণপাত প্রাপ্তি বা দূষণ ঘটার তেমন সম্ভাবনা থাকে না।

৬.৯ বিকিরণ যন্ত্রায়ন (Radiation Instrumentation)

বিকিরণ নিরোধ কার্যক্রমের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে নিঃসৃত বিকিরণ তথা তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান (detection) ও পরিমাণ পরিমাপনের সফলতার উপর।

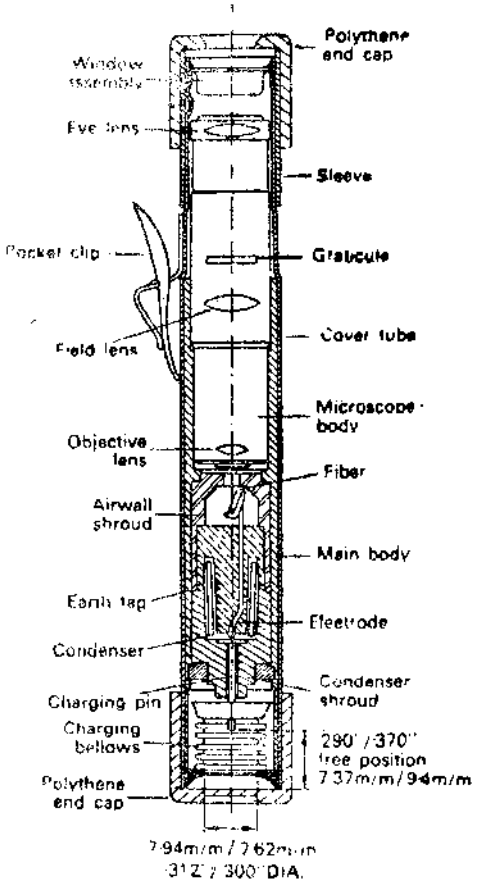

চিত্র ৬.৩ : পকেট ডসিমিটার।

যত বেশি নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত কাজ সমাধা করা যাবে ততই অযথা বিকিরণপাত এড়ানো সম্ভব হবে। বিকিরণপাত পরিমাপনের জন্য নানা রকমের বিকিরণ ডিটেক্টর ও পরিমাপক যন্ত্র রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ব্যক্তি পর্যায়ে বিকিরণপাত পরিমাপনের জন্য রয়েছে Personnel meter (যেমন Ionization Chamber)। Film badge, Portable surveymeter, fixed monitor, Pocket dosimeter, Air monitor ও অন্যান্য নানা ধরনের যন্ত্রও এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সমুদয় যন্ত্রপাতিই রুটিনমাফিক ক্রমাঙ্কন (calibration) ও প্রমিতকরণ (standardization) করার দরকার রয়েছে।

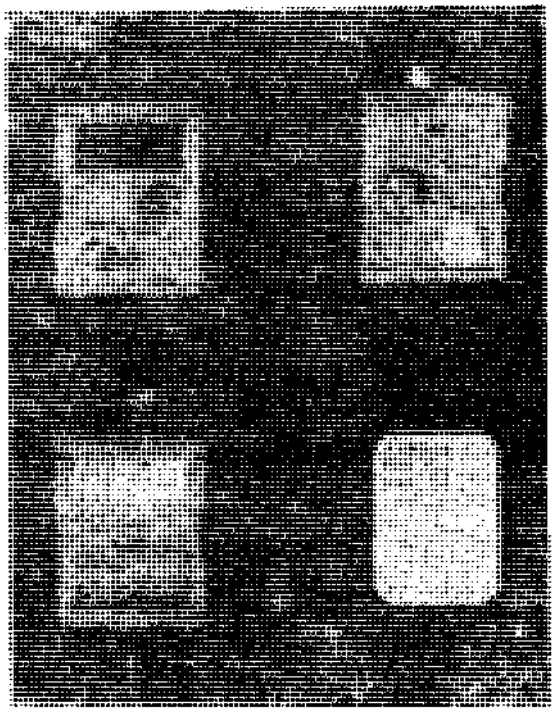

চিত্র ৬.৪ : ফিল্ম ব্যাজ ডসিমিটার।

৬.১০ তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরিবহণ (Transportation of radioactive materials)

তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিরাপদ মওজুদাগার বা কার্যস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরণের আগে যথাযথ ছাড়পত্র ইস্যু করতে হবে। স্থানান্তরণের পূর্বেই পথে কি কি অঘটন

ঘটতে পারে তা ভেবে রাখতে হবে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পূর্বপ্রস্তুতি থাকতে হবে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ স্থানান্তরণের কাজ উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করতে হবে।

৬.১১ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (Management of radioactive wastes)

যে কোনো তেজস্ক্রিয় বস্তু ব্যবহারকালে কিছু না কিছু বর্জ্য উৎপন্ন হয়েই থাকে। বর্জ্যগুলি তেজস্ক্রিয় বিধায় জনস্বাস্থ্যের প্রতি যথেষ্ট হুমকিস্বরূপ। তাই যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। এগুলির সুব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। তেজস্ক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যাটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। এ সমস্যাটি নিয়ে দেশে দেশে বিজ্ঞানী ও সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের চিন্তাভাবনার অন্ত নেই। কিন্তু কোনো সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হচ্ছে না। পরমাণু-শক্তির উৎপাদন ও প্রয়োগ প্রতিহত করার জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সমস্যা বিশ্বব্যাপী এর বিরুদ্ধবাদীদের হাতে মোক্ষম এক অস্ত্র হয়ে উঠেছে। তবে সমস্যা যাই হোক না কেন এ কথা মানতেই হবে যে তেজস্ক্রিয়তার মধ্যেই বেড়ে উঠেছে এ জীবমণ্ডল, বর্তমানেও বাড়ছে এবং ভবিষ্যতেও বাড়বে কারণ, আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র তেজস্ক্রিয় উপাদান আর মহাকাশ থেকেও জীবমণ্ডলে অবিরত বর্ষিত হচ্ছে মহাজাগতিকরশ্মি। মানুষ স্বীয় কল্যাণ সাধনে ও জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্য ট্রেস মাত্রায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহকে একত্র করছে অথবা উৎপন্ন করছে। প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহারের পর আবার তা যদি ট্রেস মাত্রায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেওয়া হয় সর্বত্র তবে তাতে বিপদাশঙ্কা থাকলেও মারাত্মক বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনা তেমন নেই বললেই বলে।

তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের ভৌত অবস্থা (যেমন কঠিন, তরল, গ্যাসীয়), নিঃসৃত বিকিরণ (যেমন আলফা, বিটা, গামা রশ্মি, ইত্যাদি) সক্রিয়তার পরিমাণ (নিম্ন, মাঝারি না উচ্চ সক্রিয়তার), অর্ধজীবন, জীবদেহে বিপাকীয় ধর্ম ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে এর অপসারণ (disposal) ও ব্যবস্থাপনার পন্থা ও কৌশলাদি।

সপ্তম অধ্যায়

সুস্বাস্থ্য লাভে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ
(Radiation for good health)

৭.১ ভূমিকা

স্বাস্থ্য বলতে সাদামাটাভাবে দেহে রোগব্যাধির অনুপস্থিতি বুঝানো হয়ে থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞান মানুষকে রোগমুক্ত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজো তা সর্বতোভাবে সফল হয়ে উঠে নি। তবুও রোগব্যাধি নিবারণ, উপসর্গ বিশ্লেষণ করে রোগ নিরূপণ এবং ন্যূনতম খরচে রোগ নিরাময়ের উদ্যোগ ক্রমশই এগিয়ে চলেছে। সুস্বাস্থ্য অর্জনে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও রেডিওআইসোটোপ সম্বলিত বহুবিধ পারমাণবিক চিকিৎসা প্রযুক্তি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

সুস্বাস্থ্য লাভে পারমাণবিক প্রযুক্তির ব্যবহার পারমাণবিক ফিশন (fission) ও শৃঙ্খল বিক্রিয়া (chain reaction) আবিষ্কারের মাধ্যমে পারমাণবিক শক্তি হস্তগত করার বহু আগেই শুরু হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে এক্স-রে ও রেডিয়াম আবিষ্কারের সাথে সাথেই রোগ নির্ণয়, রোগ নিরাময় ও ক্যান্সার চিকিৎসায় এ সবের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ উদ্ভাবনের সাথে সাথে চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগ নির্ণয়ে ও গবেষণায় ট্রেসার (tracer) হিসেবে এদের সফল প্রয়োগ শুরু হয়েছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য সুইডেনের বিজ্ঞানী স্যার জন হেভেসীকে ১৯৪৩ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ডিটেকশন ও পরিমাপনে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধনের সাথে সাথে নানাবিধ রেডিওআইসোটোপও উৎপাদিত হতে থাকে। ফলে চিকিৎসাশাস্ত্রে এদের ব্যাপক প্রয়োগ শুরু হয়ে যায়। পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সাথে উপজাত (by-product) হিসেবে নানা ধরনের অজস্র রেডিওআইসোটোপ উৎপাদিত হয়ে থাকে আর এদের ৭০% ভাগই চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগ নির্ণয়, রোগ নিরাময় ও গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে আজ পারমাণবিক প্রযুক্তির প্রয়োগ অপরিহার্য নয়। অনেক আধুনিক প্রযুক্তি যেমন ফটো-বর্ণালীমিতি (Photospectrometry), অতিশব্দ (Ultrasound), কম্পিউটার-এইডেড টোমোগ্রাফি (Computer aided tomography, CAT) ও নিউক্লীয় চৌম্বক অনুনাদ (Nuclear magnetic

resonance, NMR)-এর পরিপূরক হিসেবে পারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

পারমাণবিক-চিকিৎসা পদ্ধতিতে তেমন কোনো ঝুঁকি ছাড়াই রোগীরা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে উপকৃত হচ্ছেন। এ চিকিৎসা পদ্ধতির হাতিয়ার হচ্ছে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ তথা রেডিওআইসোটোপ যা কিনা একই মৌলের বিভিন্ন পারমাণবিক ভরের তথা ওজনের পরমাণু। রেডিওআইসোটোপ থেকে ক্ষেত্রভেদে কণিকা (যেমন আলফা, বিটা, ইত্যাদি) বা গামা-রশ্মি অথবা উভয়ই নির্গত হয়ে থাকে। আর এদের নির্গমনের হারকেই সংশ্লিষ্ট তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সক্রিয়তা (activity) বলা হয়। প্রতিটি তেজস্ক্রিয় উপাদানের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যমূলক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ রয়েছে যার সাহায্যে এদেরকে অতি সহজেই সনাক্ত করা যায়।

রোগভেদে ও রোগাক্রান্ত অঙ্গ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। সচরাচর গামা-রশ্মি নিঃসরণকারী স্বল্প অর্ধায়ুর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপই বেশি ব্যবহৃত হয়। এর সবই কৃত্রিম উপায়ে পারমাণবিক চুল্লি ও ত্বরণযন্ত্র দ্বারা উৎপাদিত হয়। এ যাবত এ ধরনের প্রায় ২০০০-এরও অধিক সংখ্যক তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সন্ধান মিলেছে।

পরমাণবিক-চিকিৎসায় ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি আইসোটোপ হচ্ছে আয়োডিন—১৩১, টেকনেশিয়াম—৯৯m, স্ট্রন-শিয়াম—৯০ ইত্যাদি।

পারমাণবিক চিকিৎসার বহুল প্রয়োগ বিশ্ব জুড়ে চালু রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এ চিকিৎসা পদ্ধতি সমধিক প্রসিদ্ধি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বর্তমানে প্রায় দশটির মতো পারমাণবিক চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে শত শত রোগী চিকিৎসা-সুবিধা ভোগ করছেন। গলগণ্ড রোগের চিকিৎসায় পারমাণবিক চিকিৎসা পদ্ধতি ছাড়া তেমন কার্যকর আর কোনো ব্যবস্থা নেই। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বর্তমানে দেশের বহু নর-নারী ও শিশু এ রোগে ভুগছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের আরো অনেক চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা দরকার।

অধুনা রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে নিয়োজিত বহুবিধ পারমাণবিক প্রযুক্তির কয়েকটি হচ্ছে :

(১) পারমাণবিক ঔষধ চিকিৎসা (Nuclear Medicine)

(২) পারমাণবিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রয়োগ-কৌশল (Nuclear Analytical Techniques)

(৩) বিকিরণ জীববিদ্যা (Radiation Biology), এবং

(৪) বিকিরণ মাত্রায়ন (Radiation Dosimetry)

পারমাণবিক চিকিৎসায় রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলির কয়েকটি সম্পর্কে নিম্নে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) থাইরয়েড আপটেক (Thyroid uptake) যন্ত্র : রোগীকে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় আয়োডিন-১৩১ সেবন করানোর পর নির্ধারিত সময়ান্তরে থাইরয়েড গ্রন্থিতে গৃহীত আয়োডিনের শতকরা হার এ যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়। স্বাভাবিক থাইরয়েড গ্রন্থি নির্ধারিত সময়ে প্রায় সুনির্ধারিত পরিমাণ আয়োডিন গ্রহণ করে থাকে ; কিন্তু অস্বাভাবিক গ্রন্থি কম বা বেশি পরিমাণে গ্রহণ করে। এ থেকে গ্রন্থিটির কার্যকারিতা তথা শারীরিক অসুস্থতা নির্ণয় করে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়।

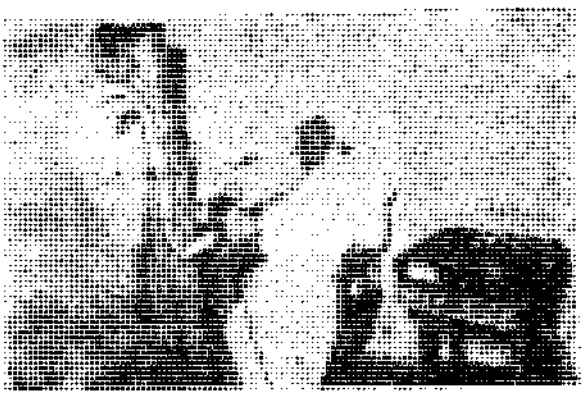

চিত্র ৭.১ : থাইরয়েড আপটেক পদ্ধতি।

(খ) লিনিয়ার স্ক্যানার (Linear Scanner) ঃ এ যন্ত্রের দ্বারা থাইরয়েড গ্রন্থির প্রত্যেক অংশে সেবনকৃত আয়োডিন গ্রহণের শতকরা হার পরিমাপনের মাধ্যমে গলগ্রন্থির প্রতিচিত্র গ্রহণের পর তাতে কি ধরনের অস্বাভাবিকতা রয়েছে তা নিরূপণ করা হয়। তা ছাড়া এ যন্ত্র ব্যবহার করে তেজস্ক্রিয় টেকনেশিয়াম-৯৯m-এর সঙ্গে বিভিন্ন কিট মিশিয়ে যকৃত (liver), কিডনি, হাড়, মস্তিষ্ক, প্লীহা (spleen), হৃদপিণ্ড ইত্যাদি দেহাঙ্গের প্রতিচিত্র গ্রহণ করে ফোঁড়া, টিউমার, ক্যান্সার ও অন্যান্য জটিল রোগের উপস্থিতি নিরূপণ, ব্যাপ্তি, অবস্থান পর্যায়, ইত্যাদি নির্ণয় করা যায়।

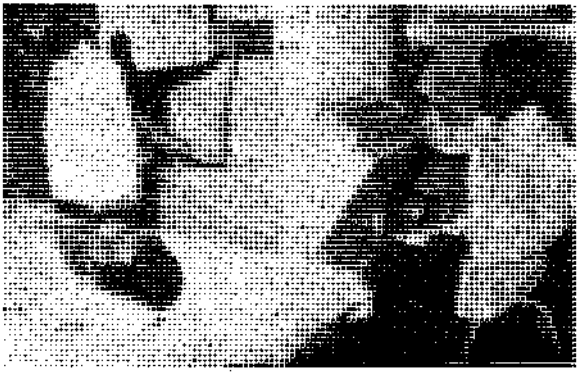

চিত্র ৭.২ : থেকটিলিনিয়ার স্ক্যানার।

(গ) টেরিজিয়াম অ্যাপ্লিকেটর : চোখের টেরিজিয়াম অপারেশনের পর পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এ পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য পর পর দু'দিন (মোট ২ বার) স্ট্রনশিয়াম-৯০ থেকে উৎসারিত বিটা-রশ্মি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। ফলে আর পুনরাবৃত্তি ঘটে না।

(ঘ) গামা ক্যামেরা (Gamma Camera) : এ যন্ত্রের সাহায্যে লিনিয়ার ও অন্যান্য স্ক্যানার-এর চেয়ে দ্রুত তেজস্ক্রিয় পরমাণুচিত্র তথা আপটেকের ধরনধারণ

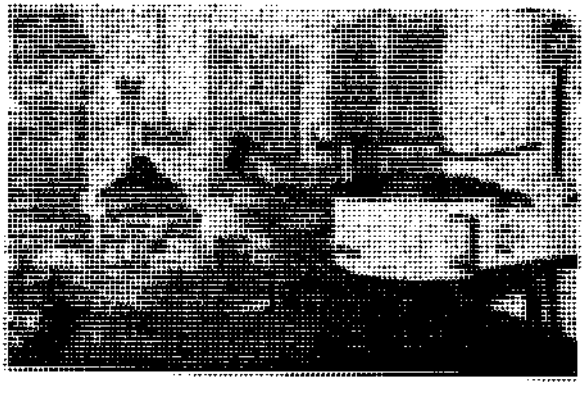

চিত্র ৭.৩ : যন্ত্রাংশসহ গামা-ক্যামেরা।

জানা যায়। কম্পিউটারাইজড গামা ক্যামেরার সাহায্যে বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন ও তাদের কার্যক্ষমতা বিশ্লেষণ করা যায়। পারমাণবিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ যন্ত্রের

উপযোগিতা সর্বাধিক। এক কথায় পারমাণবিক চিকিৎসা পদ্ধতির নার্ভসেন্টার হচ্ছে গামা ক্যামেরা।

(ঙ) রেনোগ্রাম (Renogram) ঃ কিডনীর কার্যকারিতা পরীক্ষণে ও এর নানাবিধ রোগ নিরূপণে রেনোগ্রাম যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। তজ্জন্য অতি অল্পমাত্রায় তেজস্ক্রিয় ঔষধ (আয়োডিন-১৩১, PAH বা Hippuran) ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করানো হয়। চার্টের সাহায্যে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কার্যকারিতা ধরা যায়।

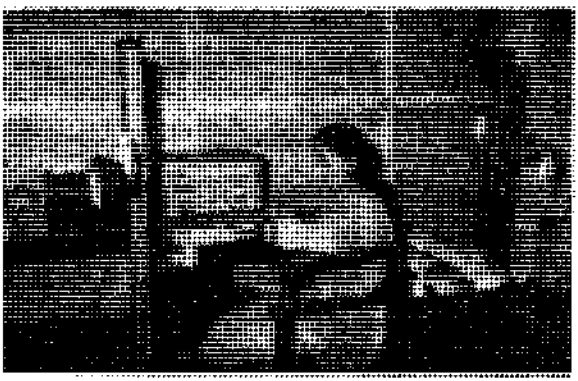

চিত্র ৭.৪ : রেনোগ্রাম।

(চ) কুয়াকৃতি সিন্টিলেশন কাউন্টার (Well-type Scintillation Counter) ঃ এটি এক ধরনের অতি সংবেদী গামা গণনাযন্ত্র। রক্তের থাইরয়েড হরমোন পরিমাপনসহ গবেষনাগারের সমুদয় in vitro কর্মকাণ্ডের সূক্ষ্ম পরিমাপনে এ যন্ত্র একান্তই অপরিহার্য। যে কোনো তেজস্ক্রিয় নমুনার সক্রিয়তা নিরূপণে যন্ত্রটির দক্ষতা সর্বাধিক।

আজকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি এক বছরে এক কোটিরও অধিক পারমাণবিক চিকিৎসা প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রতি চারজন রোগীর মধ্যে গড়ে একজনের রোগ নির্ণয়ে পারমাণবিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এ সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং নতুন নতুন প্রয়োগ-কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণে অনেক উন্নয়নশীল দেশেও এ চিকিৎসা পদ্ধতির বহুল প্রয়োগ প্রচলিত হচ্ছে এবং জনপ্রিয়তাও বেড়েই চলেছে। নতুন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে নিম্নোক্তগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ্য—

স্থানিক (Insitu) পদ্ধতি ঃ এক্ষেত্রে রোগীর দেহ থেকে সংগৃহীত পদার্থে তেজস্ক্রিয় ট্রেসার (tracer) মিশিয়ে দেহের হরমোন, ভিটামিন, পুষ্টিপদার্থ, ঔষধ, ইত্যাদি দেহে সঞ্চারণ সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা হয়। রেডিও—ইম্মিউনো অ্যাসে (Radioimmino Assay, RIA) প্রক্রিয়া এ বিষয়ে সর্বোত্তম প্রক্রিয়া। রোগ নির্ণয়ে নিয়োজিত বহুশত বিকারক (reagent) এ পদ্ধতিতে নিরূপণ করা যায়। RIA স্বল্প খরচে সহজ উপায়ে রোগ নির্ণয়ের বহুল প্রয়োগের হাতিয়ার।

রেডিওথেরাপি ঃ তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাত দ্বারা জীবদেহের ক্যান্সারাক্রান্ত কোষসমূহ নিপাত করা যায়। ফলে ক্যান্সার দেহে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তেমন থাকে না। রেডিওথেরাপি দেওয়ার পর ক্যামোথেরাপি ও ফিজিওথেরাপির সমন্বিত প্রয়োগে অনেক রোগের উপশম হয়।

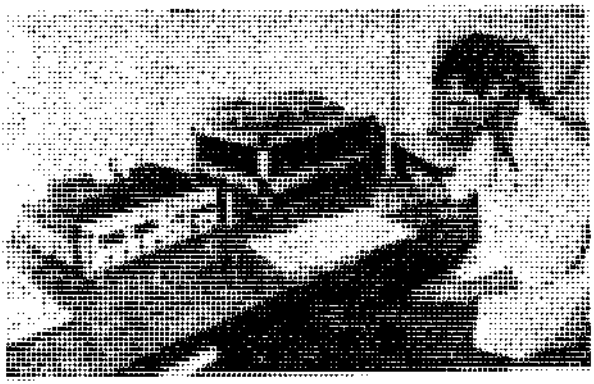

চিত্র ৭.৫ঃ স্বয়ংক্রিয় নমুনা পরিবর্তনকারী এবং মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক আর. আই. এ. উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি।

পারমাণবিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রয়োগ-কৌশল ঃ দেহপুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে নিউক্লীয় বিশ্লেষক কলা-কৌশলের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে সুস্বাস্থ্যের জন্য মোটের উপর ১৫টি একান্ত আবশ্যকীয় (essential) উপাদান ট্রেস-মাত্রায় খাদ্যবস্তুতে বিদ্যমান থাকা দরকার। তন্মধ্যে আয়োডিন, লোহা, তামা, দস্তা, কোবাল্ট, সেলিনিয়াম ইত্যাদি প্রধান। তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের ফলে এদের মধ্যে পরপ্রভা (luminescence) বর্তায় এবং বৈশিষ্ট্যমূলক এক্স-রে নির্গত হয়। ফলে অতি সহজেই এদেরকে সনাক্ত ও পরিমাপ করা যায়। তাছাড়া

নিউট্রনপাত দ্বারাও এদের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্ট করা যায়। সাধারণত পারমাণবিক চুল্লি, নিউট্রন জেনারেটর, ত্বরণযন্ত্র, ইত্যাকার যন্ত্র দ্বারা কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা বস্তুতে আবিষ্ট করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিটি নিউট্রন সক্রিয়ণ বিশ্লেষণ (Neutron activation analysis, NAA) হিসেবেই সমধিক পরিচিত। কোনো পদার্থে বিদ্যমান অজ্ঞাত উপাদান সনাক্তকরণ ও পরিমাণ নিরূপণে এ কৌশলের জুড়ি মেলা ভার। তাই এ পদ্ধতির ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ইহা জীবদেহ, খাদ্যসামগ্রী ও পরিবেশে বিদ্যমান বহুবিধ ট্রেস উপাদান নিরূপণে সহায়তা করে। পারমাণবিক ঔষধ কৌশল রোগের মূল কারণের খোঁজে দেহের পরিবেশে তন্নতন্ন করে পরীক্ষা চালায় আর পারমাণবিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি দেহ-সন্নিহিত পরিবেশে কি পরিবর্তনের দরুন কোনো রোগের উৎপত্তি ঘটে তা পরীক্ষা করে দেখে।

বিকিরণ জীববিদ্যা

বাহ্য উৎস থেকে বিকিরণ প্রয়োগের মাধ্যমে পরিবেশ পরিবর্তনের দ্বারা রোগ উচ্ছেদের কাজে এ শাখা নিয়োজিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রয়োগে শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি, সেলাই সুতা, গজ, ব্যাণ্ডেজ, তুলা ইত্যাদি সরঞ্জাম, ঔষধ সামগ্রী, প্যাকেট, শিশি, বোতল প্রভৃতি, সহজে ও নির্ভর-যোগ্যভাবে নির্বীজন করা যায়। এ সব সরঞ্জাম প্রথমে পলিথিন বা অপ্রবেশ্য থলিতে ভরে মুখ বন্ধ করে সুনির্দিষ্ট মাত্রায় বিকিরণপাত দিলে জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর প্যাক (seal) না খোলা পর্যন্ত কোনো রকম জীবাণু ঢুকতে পারে না বিধায় নির্বীজিত অবস্থায় থেকে যায়। দেখা গেছে সফল অস্ত্রোপচারের পরও পরবর্তীকালে শুধুমাত্র সরঞ্জামাদিতে বিদ্যমান জীবাণুর কারণে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রমণের দরুন বহু রোগীর মৃত্যু ঘটে।

ক্যান্সার : অস্ত্রোপচারের পরে থেকে যাওয়া অবশিষ্ট ক্যান্সার-কোষ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ প্রয়োগে বিনাশ করা চলে। শাক-সব্জি, ফল-মূল, মাছ-মাংস, শস্যদানা, ইত্যাদিতে তেজস্ক্রিয় বিকিরণপাতের ফলে পোকামাকড় ও তাদের ডিম ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে তাদের সংরক্ষণ-কাল (shelf-life) অনেক বেড়ে যায়। ফলে শস্যের মড়ক ও আপদ নিবারণে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই খাদ্যাভাব এড়ানো সম্ভব হয়েছে। চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট গিরি এলাকায় বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ও বেল্জিয়মকো এর যৌথ উদ্যোগে খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু বিকিরণপাতের মাধ্যমে

সংরক্ষণের জন্য Irradiation plant স্থাপন করা হয়েছে এবং বর্তমানে এটি চালু রয়েছে। বিকিরণের এমনি আরো হাজারো প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে জীববিজ্ঞানে এবং এ ধরনের প্রয়োগ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

বিকিরণ মাত্রায়ন (Dosimetry)

জীবদেহের বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ পরিবেশে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিকিরণপাতের পরিমাণ, কার্যকারিতা ও জীবদেহের উপর প্রভাব নিরূপণ করা একান্ত অপরিহার্য। অন্যথায় অতিবিকিরণপাত (overexposure) বা অববিকিরণপাত (underexposure) ঘটার আশঙ্কা থাকে। অতিবিকিরণপাতের দরুন বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব বেড়ে গিয়ে ব্যক্তিবিশেষের জীবননাশ ঘটতে পারে। আবার রোগ নিরাময়ে বিকিরণপাত প্রয়োগের সময় সঠিক বিকিরণপাত না ঘটার কারণে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না এবং রোগ নিরাময়ও হবে না। তদ্রূপ পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে বিকিরণপাতের পরিমাণ যথাযথ না জানলে যে কোনো সময় অতিবিকিরণপাত ঘটে যেতে পারে। তাই বিকিরণপাত পরিমাপন ও মাত্রায়নে যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়ে গবেষণাগার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রে এক্স-রে

আবিষ্কারক পদার্থবিদ উইলিয়াম কনরাড রন্টগেন এক্স-রে আবিষ্কারের প্রতিবেদনে এক্স-রে ব্যবহার করে তাঁর স্ত্রীর হাতের যে ছবি দিয়েছিলেন তা' দেখেই অনেক মেধাবী চিকিৎসকের মাথায় চিকিৎসাশাস্ত্রে এক্স-রে প্রয়োগের বিপুল সম্ভাবনার চিন্তা আসে। কারণ ছবিটিতে হাড়ের গঠন, পুরুত্ব, জোড়া, বক্রতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য এতই স্পষ্ট ও নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছিল যে নানা কাজে এর সফল প্রয়োগের ভাবনা সৃজনশীল ব্যক্তিদের মনে উঁকি দেয়। আর ভাবনা অনুযায়ী অনেকেই কাজেও লেগে যান। ফলে এক্স-রে'র ব্যবহার দিন দিন বেড়ে চলতে থাকে। হাড় ভাঙা, মচকানি বা যে কোনো অসুবিধার কারণ নিরূপণে, দেহে-বিদ্ধ বুলেট বা কঠিন পদার্থ সন্ধানে তথা ভাঙা হাড় সঠিকভাবে সংস্থাপিত ও সংযোজিত হয়েছে কিনা ইত্যাকার পরখের কাজে এক্স-রে'র বহুল প্রয়োগ প্রচলিত হয়ে যায় আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই। রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে এক্স-রে'র অপরিহার্যতা আজ আর ব্যাখ্যা করে বলার দরকার পড়ে না। রোগব্যাধির বিরুদ্ধে যুদ্ধে এক্স-রে আধুনিক চিকিৎসকের হাতে এক মোক্ষম অস্ত্র।

এক্স-রে'র ব্যবহার শুধু চিকিৎসাশাস্ত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। যে কোনো বস্তুর নিঃধ্বংসী পরখ (Non-destructive testing), শিল্পক্ষেত্রে গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ ও গুণ বিচার, কৃষিক্ষেত্রে শস্য সংরক্ষণ, কীট নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নে এক্স-রে'র বহুল প্রয়োগ চালু রয়েছে। দিন দিন এর প্রয়োগের পরিধি বেড়েই চলেছে।

উপসংহার

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিকিরণের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনাতীত ও অপরিসীম। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো বস্তু বা প্রক্রিয়াই অবিমিশ্র কল্যাণকর নয়। মঙ্গলের সাথে অমঙ্গলও হাত ধরাধরি করে চলে। বিকিরণপাতও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম নয়। যেমন অতিবিকিরণপাত দেহে নানা ছোট খাট উৎপাতের সৃষ্টি থেকে প্রাণঘাতী ক্যান্সার পর্যন্ত সৃষ্টি করতে পারে, গর্ভপাত ঘটায়, বিকলাঙ্গ ও হাবাগোবা শিশুর জন্ম দেয়। এমন আরো কত কি! তাই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা বিকিরণের নিরাপদ ব্যবহারের নানাবিধ পন্থা, বিকিরণপাতের অনুমোদিত মাত্রা, ব্যবহারবিধি, ইত্যাদি সুপারিশ করেছে। বিকিরণ ব্যবহারকালে এসব বিধি-নিষেধ মেনে চললে ও অনুমোদিত বিকিরণমাত্রার আওতাধীনে বিকিরণকে ব্যবহার করলে তেমন কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকে না। তাই মানব কল্যাণে বিকিরণের মঙ্গলকর শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর জন্য এ সমুদয় ব্যবহারবিধি ও নির্দেশিকা মেনে বিকিরণ ব্যবহার করা উচিত আর ব্যবহারের পূর্বেই এগুলি জেনে নেওয়া দরকার। যে কোনো বিকিরণপাত পদ্ধতি কাজে লাগানোর আগে বিকিরণ নিরোধে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Recommendations of the International Commission on Radiological Protections, ICRP Publications 3, 4, 8, 11, 22, 24, 25, 26—60, published from 1959 to to-date.
2. Reports of the International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU), published from 1960 to to-date.
3. Reports of National Commission on Radiological protection (NCRP), published from 1949 to to-date.
4. Safety Series, published by the International Atomic Energy Agency (IAEA)
5. Radiation Detection and Measurements by G. F. Knoll, John Wiley and Sons, New York, Toronto.
6. Introduction to Health Physics by H. Comber, Second Edition—Revised and enlarged, Pergamon Press, New York.

BANSDOC Library
Accession No. 18889